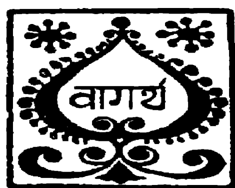
অতুলপ্রসাদ

[অতুলপ্রসাদ সেন প্রসঙ্গে]

বিনয়েন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত



Atulprasad

[Memoirs of Atulprasad Sen]

By Professor B. N. Dasgupta,

Formerly, Professor of Lucknow University
and Vice-Chancellor of North Bengal University.

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর,১৩৬৩

প্রচ্ছদশিল্পী শ্রীআশিস্ চৌধুরী। 'বাগর্থ'-এর পক্ষে শ্রীপ্রশান্তকুমার পালিত কর্তৃক
১/৩ কৃষ্ণরাম বসু স্ট্রীট, কলিকাতা-৪ থেকে প্রকাশিত এবং শান্তিনাথ প্রেসের
পক্ষে শ্রীজগন্নাথ পান কর্তৃক ১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট থেকে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

আমার অগ্রজ

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের

স্মৃতির উদ্দেশে

যাঁর কাছে প্রথম পেয়েছিলাম ভারতীয় দর্শনচিন্তার
পথনির্দেশ, আর পেয়েছিলাম সাহিত্য-প্রেরণা —
যখন তিনি লখনৌতে রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দৃষ্টির
উপরে বারোটি ভাষণ দিয়েছিলেন।

নিবেদন

অতুলপ্রসাদ সেনের কথা লিখতে হলেই লখনৌর কথা এসে যাবে, কারণ তাঁর কর্মজীবন, পৌরজীবন, কবিজীবন ও শেষজীবন সবই লখনৌতে কেটেছে। সুতরাং অতুল-স্মৃতি লিখতে লিখতে লখনৌর স্মৃতি লিখতে বাধ্য হয়েছি — সেগুলি যে কেবল অপরিহার্য তাই নয়, আনন্দের উৎসও বটে। আমাদের লখনৌর জীবন আনন্দময় ও বৈচিত্র্যময় ছিল ঘটনার স্রোতে। আমি সেই ঘটনাই উল্লেখ করেছি যেগুলি কোনো-না-কোনো দিক দিয়ে সামাজিক তাৎপর্য বহন করে। চিন্তাশীল পাঠকের কাছে আমি এ জাতীয় কিছু ঘটনা এবং অন্যান্য বিষয় উপস্থাপিত করবার চেষ্টা করেছি। উনিশ শতকের যে-সামাজিক পরিবেশের পরিণতিতে অতুলপ্রসাদের কৈশোর কেটেছিল, তাঁর জীবনের উপর সেগুলির কি প্রভাব পড়েছিল এবং কি হওয়া স্বাভাবিক সেগুলিও অনুধাবনযোগ্য।

যাঁরা মনে করেন, অতুলপ্রসাদের বিষয় লিখতে গিয়ে এমন অধ্যায়গুলি বাদ দেওয়া উচিত — যাতে অপ্রীতিকর ঘটনা আছে, তাঁদের সঙ্গে আমার মতের মিল মোটেই নেই। ঐতিহাসিক দৃষ্টি না থাকলে প্রশংসার মূল্যও সন্দেহজনক মনে হতে পারে এবং পরবর্তী লেখকের পক্ষে কেবল অন্তরায় নয় একটা বড় বিঘ্নও বটে।

আমি বাংলার নবজাগরণের কিছু তথ্যের উল্লেখ করেছি, ইঙ্গিত দিয়েছি — সেগুলি বিংশ শতাব্দীর নবীনদের সম্মুখে রেখেছি। আশা করি রাজনীতির জাল এড়িয়ে, সমাজনীতির আলোচনা করে জীবনকে রসময় করলে গভীর আনন্দ পাওয়া যাবে।

অতুলপ্রসাদ সেন সম্বন্ধে একখানি মাত্র বই বেরিয়েছে — শ্রীকল্যাণ বসুর লেখা "আমারে এ আঁধারে"। অনেক লেখকই হয়তো তথ্যের জন্য এ বইটি থেকে কিছু কিছু সাহায্য পেয়েছেন। আমি আমার নিজের জানা কথাই বেশী লিখেছি। তাঁর বইটি সুপাঠ্য, তবে তিনি উপন্যাসের ঢং-এ কেন জীবনী

লিখলেন তা জানি না। আমি এ থেকে অতুলপ্রসাদের দানপত্রের প্রতিলিপি নিয়েছি, তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

হিরণ আয়াঙ্গার তাঁর চিঠি ও তাঁর দাদার কবিতার তর্জমা ছাপাতে বিশেষ অনুরোধ করেছিলেন। সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলাম।

কোন দিন ভাবিনি এই লেখা-কাজে আমি লিপ্ত হবো—তাই সমস্ত লেখাটা স্মৃতিচারণের মধ্যে। যদি অসঙ্গতি থাকে তবে পাঠক মার্জনা করবেন।

শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

সূচীপত্র

পরিশিষ্ট

Sri Atul Prasad Sen of hallowed memory

Friend !

You sang : "Give all, O heart, thy beat : thy love,
Even as a flower all her best : her face."
This by your daily life you came to prove
With lovely hymns to God's own loveliness.

And so you won from Him the power to see
Which made you laugh at pain : for through the gloom
You spied "His hand of Light"·· In memory
We bow to you, O Poet of mystic bloom !

Dilip*

অতুলপ্রসাদ,

প্রেমিক ! তুমি গেয়েছিলে : "বিলিয়ে দে তুই ফুলের মতন
যা আছে তোর বিশ্বজনে ভালোবেসে করতে আপন।"
পান্থ ! ব্যথার অন্ধকারেও দেখতে তুমি পেয়েছিলে—
অলক্ষ্যে কে চালায় তোমায় তীর্থপথে—চেয়েছিলে
সেই শিবেরি আঁকতে ছবি অশ্রুকণ্ঠী কৃতজ্ঞতায়
উচ্ছলিয়া বেদনায়ও প্রেমের উষা-আরাধনায়
সঙ্গোপনে, লাজুক কবি ! সহজিয়া আত্মদানে —
তাঁর শ্রীচরণ করে বরণ, গহন প্রাণে গানে গানে।

দিলীপ*

হরিকৃষ্ণ মন্দির, পুণা থেকে, দিলীপকুমার রায়

অতুল-প্রণাম

বিশ্বহৃদিপদ্মে বসি' কমলা-আসীনা
বাজায় যে সুমধুর অনাহত বীণা
অব্যক্ত সরসঘন অমূর্ত আভায়,
সুর তার দেশে দেশে, দিশে দিশে ধায়
বিলায়ে বিমল জ্যোতি, স্নিগ্ধ শান্তিধারা —
মুক্ত করি অজ্ঞানের অন্ধকার-কারা।

আকাশের মর্মমূলে পাতি নিজ কান
যে মানুষ করে সেই সুরের সন্ধান ;
জীবনের শতদলে বসাইয়া তারে
আপন তানের সাথে মিলাইতে পারে —
সে সাধক মরণেরে করিয়াছে জয়।
যুগান্তের ইতিহাস তাঁরই তরে বয়
অমর আনন্দ-বার্তা ; স্বদেশ, ধরণী
তাঁর তরে রেখে দেয় স্মরণের খনি
নিত্য পরিপূর্ণ করি ; নটরাজ এসে,
বহু মানে সমাদরে স্নেহে ভালবেসে —
স্বয়ং মস্তকে বহি' আশীর্বাদী-ডালা,
খুলে দেয় গলে তাঁর স্বকণ্ঠের মালা
উচ্চারি বিজয়-মন্ত্র আর পুণ্য নাম,
পূর্ণ করি' সাধকের সর্বমনস্কাম।

তব জন্ম-শতাব্দীর পবিত্র প্রভাতে
হে সুরসাধক-স্রষ্টা ! আমি জোড় হাতে
'তোমার শাশ্বত নাম মনে মনে স্মরি'
শ্রদ্ধায় আনত শিরে নমস্কার করি।

ভবানীপুর
কলিকাতা-২৫

শ্রীকালীপদ দেবশর্মা (ভট্টাচার্য)

অতুলপ্রসাদ ও লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়

অতুলপ্রসাদ সেনের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯২৪ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যসমিতির এক সভায়। তিনি ছিলেন এই শীর্ষসমিতির অন্যতম সদস্য। আমি অধ্যাপক ও ফ্যাকাল্‌টির ডীন পদে নিযুক্ত হয়েছি বলে নূতন সদস্য হয়ে আমিও কর্মসমিতিতে এলাম। আমি মাত্র দুসপ্তাহ পূর্বে লণ্ডন থেকে ফিরেছি, লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই চাকুরীটি সেখানেই প্রায় পাকা হয়ে যায়। প্রথম নির্বাচন লণ্ডনে, সম্পূর্ণ পাকা নির্বাচন হলো লখনৌতে এসে। মাত্র এক সপ্তাহ আগে কাজে যোগদান করেছি। মনটা আনন্দে ভরে ছিল। কর্মসমিতিতে দেখলাম বিশ-একুশজন বড় বড় হোমরাচোমরা [১] উচ্চপদস্থ অবাঙালীর মধ্যে উপকুলপতি জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী [২] বাদে, আর একজন বিলাতী পোষাকে সজ্জিত

১. আউধের তালুকদার রাজর্ষি রামপাল সিং, রাজা স্বরজ্‌ বক্‌স্‌ সিং, মহারাজা জাহাঙ্গীরাবাদ, জুডিশিয়াল কমিশনার, স্যার ওয়াজিদ্‌ হোসেন (পরে চীফ্‌ জাস্টিস্‌), বিশ্বেশ্বরনাথ শ্রীবাস্তব (পরে চীফ্‌ জাস্টিস্‌), অতুলপ্রসাদ সেন, ডঃ সৈয়দ্‌মুজফর খাঁ (মেডিসিনের ডীন), ডঃ ওয়ালী মহম্মদ (বিজ্ঞানের ডীন), এস. বি. স্মিথ (আর্টের ডীন), মিস নিকল্‌স (ইজাবেলা থোবার্ণ কলেজের প্রিন্সিপাল) ইত্যাদি।

২. পার্লামেণ্ট অফ্‌ রিলিজিয়ন্‌সে ইনিও শিকাগো গিয়েছিলেন ১৮৯৩ সনে থিয়োসফিস্টদের মুখপাত্র হয়ে। স্বামী বিবেকানন্দ অনেক বক্তৃতা দিয়েছেন লিখেছেন, হিন্দু মুখপাত্র হয়ে। ব্রাহ্মদের মুখপাত্র হয়ে যান ভাই প্রতাপচন্দ্র

মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক — চেহারা দেখে মনে হলো বাঙালী — তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় মুখেতে। এই ভদ্রলোকটি আমাকে কিছুক্ষণ যাবৎ নিরীক্ষণ করছিলেন। আমি পূর্বে কিছুই জানতাম না যে ব্যারিস্টার কবি অতুলপ্রসাদ সেন লখনৌতে থাকেন বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত। কিছুক্ষণ পর আমি ধাতস্থ হয়ে গত অধিবেশনের বিবরণী পড়ে বুঝলাম ইনিই কবি অতুলপ্রসাদ সেন, বাংলা দেশে যাঁর গানের চলন বেশ জোর চলছিল। এঁকে দেখে মনে একটা নূতন আনন্দ এলো। প্রথম থেকেই বুঝেছিলাম অতুলপ্রসাদও আমাকে দেখে আনন্দিত হয়েছিলেন — ছাব্বিশ বৎসরের এক স্বাস্থ্যবান যুবককে লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য-বিদ্যা বিভাগের শীর্ষস্থানে নিযুক্ত করা হলো — যে বাণিজ্য-বিদ্যা বিভাগের খ্যাতি শেষে ভারতের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। লোকমুখে শুনেছি এবং বিশ্বস্তসূত্রে জেনেছি যে, এই বাণিজ্য বিভাগ লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যাক্টের ভিতরে অন্তর্ভুক্ত করার মূলে ছিলেন বিচারপতি গোকরণনাথ মিশ্র এবং ব্যারিস্টার অতুলপ্রসাদ সেন।

লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতির কারণ মুখ্যতঃ সমগ্রদেশ থেকে সুনির্বাচিত অধ্যাপকদের একত্র করা, যাঁদের মধ্যে ছিলেন ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ডঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, ডঃ বীরবল সাহানী, ডঃ ওয়ালী মহম্মদ, ডঃ করম-নারায়ণ বহেল, ডঃ নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, ডঃ হীরেন্দ্রলাল দে, ডঃ শচীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ডঃ ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার, ডঃ শৈলেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ডঃ অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক নির্মল সিদ্ধান্ত, অধ্যাপক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক ভূপেন্দ্রনাথ

মজুমদার। খুব সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন প্রতাপ মজুমদার এবং বিবেকানন্দ। জ্ঞানেন্দ্রবাবু ভাল বক্তৃতা দিতে পারতেন এবং গভর্ণর স্যর হারকুর্ট বাটলারের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি পরে লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপকুলপতি নিযুক্ত হন। ইনি নববিধানী গগণ রায়ের জামাতা।

চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক ভূজঙ্গভূষণ মুখোপাধ্যায়, ডঃ আউদেশ নারায়ণ সিং, ডঃ আর. ইউ. সিং, অধ্যাপক কালীপ্রসাদ, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ রায় ইত্যাদি। শিক্ষক-নির্বাচনী কমিটিতে অনেক ডিপার্টমেণ্টে অতুলপ্রসাদ ছিলেন অন্যতম সদস্য — বিশেষ করে আইন বিভাগের নির্বাচনে তিনি প্রায় সর্বদাই থাকতেন। মোটকথা এই যে, লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে অতুলপ্রসাদের একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল।[১] বাংলাদেশের বাইরে এত বড় সংস্থাতে কমপক্ষে দুতিনজন বাঙালী শীর্ষসমিতিতে না থাকলে বিস্ময়কর মনে হওয়া খুব স্বাভাবিক। কারণ উত্তরভারতের সমস্ত স্কুল কলেজের মধ্যে বহু বহু বাঙালী শিক্ষক প্রতিষ্ঠাবান হয়েছিলেন — সংযুক্ত প্রদেশে (আগ্রা ও আউধ) এবং বিহারে তো নিশ্চয়ই। লখনৌ ভুলতে পারবে না যে, সেখানে স্বর্ণাক্ষরে শ্বেতমর্মরের উপরে খোদাই করা আছে — লখনৌ ক্যানিং কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তালুকদার রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, যে ক্যানিং কলেজকে কেন্দ্র করে পরে লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয় আরম্ভ হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেদিনকার কার্যসমিতির কাজ শেষ হলে অতুলপ্রসাদ বাইরে এসে আমাকে বললেন, "আপনি বুঝি এই প্রথম মিটিং-এ এলেন — একদিন আমার বাড়ীতে আসবেন — কেশরবাগের বাংলোতে — তখন কথাবার্তা হবে।" কয়েকদিন পর আমি কেশরবাগের বাড়ীতে গেলাম। তখন সেন মশায়ের মা ও বোনেরা সেখানে ছিলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তা হলো।

---

১. পরে একটা হলের নাম রাখা হয়েছে A. P. Sen Hall.

অতুলপ্রসাদ ও বাঙালী সমাজ

অতুলপ্রসাদের খ্যাতি ছিল উত্তর ভারতে কৃতী ব্যারিস্টার বলে — তার চেয়েও বড় জিনিস ছিল তাঁর প্রতি জনসাধারণের একটা শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। তিনি ছিলেন অমায়িক তাই সর্বজনপ্রিয়। বহু বাঙালী অবাঙালী সংস্থাকে তিনি তাঁর সাধ্যমতো অর্থ সাহায্য করতেন — মুক্তহস্ত বলে তাঁর একটা খ্যাতি ছিল। তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত বহু বৎসর কতকগুলি সংস্থার প্রেসিডেন্ট ছিলেন — যেমন, বেঙ্গলী ইয়ং মেন্‌স্‌ এসোসিয়েশন, যার হকি খেলার জন্য ভারতজোড়া সুখ্যাতি ছিল; হরিমতী গার্লস্‌ স্কুল, পরে যার নাম হয়েছে জুবিলী গার্লস্‌ স্কুল ও শেষে কলেজ। আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে লখনৌতে এসেছি তখন আমরা দেখেছি যে, বাঙালীদের মধ্যে বাংলা ভাষার চর্চা খুবই কম — বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হতো খুব নিম্ন মানে — মেয়েদের উচ্চমানের শিক্ষার জন্য কোনো বন্দোবস্ত ছিল না — ছেলেমেয়েরা নিজেদের মধ্যেও খুব কমই বাংলায় কথাবার্তা বলতো — তার মানে বাংলার সঙ্গে যথেষ্ট হিন্দি ও উর্দূ শব্দ মিশিয়ে। আমি লখনৌ এসে দেখেছি যে অনেক বাঙালীর বাড়ীতে মহিলারা পর্যন্ত উর্দূতে কথাবার্তা বলতেন — বাংলা ভাষায় নিজেকে পরিষ্কারভাবে প্রকাশ তাঁদের পক্ষে সম্ভবপর হতো না। বাংলা ভাষার ব্যবহার এত কম দেখে শঙ্কিত হয়েছিলাম। ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের অধ্যাপক ভূপেন্দ্রনাথ কর এলাহাবাদে স্থানান্তরিত হবার প্রাক্কালে যখন এসে একদিন স্কুলের কাজ আমার উপর ন্যস্ত করলেন তখন আমি প্রথমে আপত্তি জানিয়েও শেষকালটায় এ ভার নিতে রাজী হলাম। কারণ অতুলপ্রসাদ, রাধাকমল, অনিল ব্যানার্জী, বীরু রায়, অবিনাশ

চ্যাটার্জী, ধীরেন সান্যাল ইত্যাদি ব্যক্তিগণ থাকতে আমার আদর্শকে রূপায়িত করতে আমার বেশী কষ্ট হবে না — এ ধারণা আমার ছিল। বাঙালী ছেলেমেয়েদের জন্য একটি উচ্চআদর্শের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা, বাংলা সাহিত্যের আলোচনা করা, এক কথায় এই স্কুলের সাহায্যে বাঙালী ছেলেমেয়েদের শিক্ষাকেন্দ্রকে জনপ্রিয় করা এবং লখনৌ শহরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার আদর্শকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা — এই উপায়ে ধীরে ধীরে উত্তর প্রদেশের বাঙালী ছেলেমেয়েদের সাহিত্যের সঙ্গে ও সমাজ চিন্তার সঙ্গে যুক্ত করা আমার উদ্দেশ্য ছিল। স্কুলটা পাঠশালার মতো ছিল বলে আমূল পরিবর্তনে হাত দিলাম — অতুলপ্রসাদ, উপাধ্যায় মহাশয়, অক্ষয়বাবু, অপ্রকাশবাবু, সত্যেন রায় প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সমর্থন পাওয়া গেল। একদল অভিভাবক আমার কাজে অস্বস্তিবোধ প্রকাশ করতে লাগলেন, একদল কিছুটা বিঘ্ন সৃষ্টি করতে লাগলেন। কিন্তু বেশীর ভাগ প্রগতিশীল বাঙালীই আমাকে মনেপ্রাণে ও অর্থদানে সাহায্য করতে লাগলেন। আমি আর ডঃ অবিনাশ চ্যাটার্জী পূর্ণ উদ্যমে কাজ আরম্ভ করলাম এবং স্কুলের উন্নতির পথ দিন দিন পরিষ্কার হতে লাগল। অতুলপ্রসাদের উপদেশ ও সাহায্য সর্বদাই পেতাম। এই শিক্ষাবিস্তারের কাজে আমাদের প্রিয় সুহৃদ চন্দ্রভানু গুপ্ত [১] সরকারের পক্ষ থেকে এবং আমাদের বন্ধু

১. চন্দ্রভানু গুপ্ত (C. B. Gupta) ১৯২৪ থেকে আমার বিশিষ্ট বন্ধু হয়েছিলেন — যদিও বয়সে তিন চার বৎসরের ছোট। যেবার আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ নিলাম সেইবারেই ইনি এম. এ. পাশ করলেন। তাঁর অনেক কাজে আমি ছিলাম, — আমার অনেক কাজে উনি ছিলেন সহায়। ইনি অকৃতদার, কর্মী, সৎলোক — দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবার সময় আমি বিশেষ ভাবে সাহায্য করি — পরে ইনি সর্বদাই আমাদের আড্ডায় যোগদান করতেন — আমাদের ধীরু সান্যালের 'টেইলারি'-এর দোকানে আমিনাবাদ পার্কে। সেখানে প্রতি রাত্রে আড্ডা হয়। শ্রীগুপ্ত চীফ্

আইনুদ্দিন ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের পক্ষ থেকে সহায়তা করতে আরম্ভ করলেন। আমার বন্ধু বীরেন্দ্রনাথ রায় আমাকে লখনৌর ডেপুটি কমিশনার মন্‌রো সাহেবের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। তখনকারকালে ডেপুটি কমিশনার যার সহায়, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের চীফ্ একসেকিউটিভ্ অফিসার যার বন্ধু, এবং চন্দ্রভানু গুপ্ত যার কর্মসঙ্গী তার পক্ষে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের সমস্ত বাধা অতিক্রম করা খুব কঠিন ছিল না। আমি ডেপুটি কমিশনারের সাহায্যে ইন্‌ডাস্ট্রিয়াল এস্টেটের প্রান্তে অতি বিস্তৃত (আট বিঘা) একখণ্ড জমি বিনামূল্যে পেয়েছিলাম; কিন্তু ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের যাওয়া-আসার অসুবিধার জন্য গ্রহণ করিনি, তারপর চন্দ্রভানু গুপ্তের বিশেষ সাহায্যে শহরের একপ্রান্তে রেলওয়ে স্টেশনের কাছে কান্যকুব্জ কলেজের প্রতিবেশী হয়ে আট বিঘা জমি বিনামূল্যে পেয়েছিলাম এবং সানন্দে গ্রহণ করে স্কুলের বাসস্থান তৈরী করেছি। গৃহ-নির্মাণের আরম্ভে সমস্ত ব্যয় বাঙালীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি। অতুলপ্রসাদ জীবিত থাকতেই অর্থ সংগ্রহ আরম্ভ করেছিলাম --- অনেক প্রতিশ্রুতি আমার ঝোলায় ছিল — আমি তাঁকে সময়-সময় দেখাতাম এবং অনুমতি নিতাম। আগে থেকেই বাঙালীদের স্থাপিত একটা ছেলেদের স্কুল (কুইন্‌স্ এ্যাংলো

মিনিস্টার হয়েও ধীরুদার দোকানে আসা বন্ধ করেননি। রাজনীতিতে আমার সঙ্গে মত-বিরোধ হয় — বিরোধ হবার পূর্বে ইনিই সুভাষ বসুকে আমার অতিথি করিয়েছিলেন দুইবার। ইনি এখনো আমাদের বন্ধু। ১৯৩৬ সালে লখনৌতে ন্যাশনাল কংগ্রেসের অধিবেশনের পর — তিনি এবং আমি মতিলাল মেমোরিয়াল সোসাইটির প্রথম দুজন প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য হয়েছিলাম। আমাকে তিনি সেই অধিবেশনের অনরারী অডিটর করে সম্মানিত করেছিলেন। তখন জহরলালের সঙ্গে দুবার সাক্ষাৎ হয়।

সংস্কৃত স্কুল) ছিল, পরে যা ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে পরিণত হয়েছে। ছেলেদের লেখাপড়ার প্রয়োজনটা কিছু পরিমাণে মিট্‌ত।

আমাদের এই মেয়েদের স্কুলটা উত্তরকালে কলেজে পরিণত হয়ে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের অনেক সাহায্য করেছিল এবং এখনো করছে। অতুলপ্রসাদ বাঙালী মেয়েদের এই স্কুলের আপন ভবন দেখে যেতে পারেননি। কিন্তু তাঁর শুভেচ্ছা আর প্রেরণা এবং অন্যান্য বাঙালীদের শুভেচ্ছা ও সাহায্য লখনৌর জনসাধারণ চিরকাল মনে রাখবে। বাস-ভবন নির্মাণের পূর্বে এই বিস্তৃত জমিকে উপযোগী করবার জন্য যে প্রচণ্ড চেষ্টা ও সাহায্যের দরকার ছিল তার জন্য লখনৌবাসী বাঙালীরা ডঃ অনিল ব্যানার্জীর (পাবলিক হেল্‌থ্‌ ডিপার্টমেণ্টের ডিরেক্টর) কাছে ঋণী। অতুলপ্রসাদের কাছ থেকে অনেক উদ্দীপনা পেয়েছিলাম। আমি যখন এই অর্থ সংগ্রহের জন্য দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হতাম তখন অনেকেই একটা বিশেষ সর্তে অর্থসাহায্যে রাজী হতেন যে, স্কুলটি ভবিষ্যতে কোনো বিশেষ ব্যক্তির নাম বহন করবে না। আমি সম্রাটের জুবিলী উপলক্ষে এবং ডেপুটি কমিশনার মন্‌রো সাহেবের কাছ থেকে বিশেষ সাহায্য পেয়েছিলাম বলে স্কুলের জন্য এমন একটি নামের প্রস্তাব করলাম যেটা নিয়ে আমাদের মধ্যে স্বার্থের কোনও প্রশ্ন উঠলো না। এই সময়ে লখনৌ শহরের কয়েকজন গণ্যমান্য লোকের অনুরোধে আমাকে বিদ্যান্তপরিবারের কাছে যেতে হয়েছিল মোটাহাতে কিছু দান অথবা অর্থসাহায্য পাব এই আশায়। সেখানে গিয়ে স্বামী সত্যানন্দের সঙ্গে দেখা হলো — খুব ভাল লাগলো। কথাবার্তা উঠতে তাঁরা বললেন — এই রকম বিলাতী পদ্ধতিতে শিক্ষা মোটেই তাঁরা পছন্দ করেন না — হিন্দু ব্রতাদি অবলম্বনে প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির আদর্শানুযায়ী শিক্ষা-প্রসারের বন্দোবস্ত যদি না থাকে তবে অর্থ সাহায্য সম্ভবপর হবে না। আমি প্রাচীনপন্থী হতে রাজী নাই। আমি ফিরে এলাম। পরে তাঁরা

শশীভূষণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। তাতে প্রাচীন শিক্ষা, অনুশীলন, ধর্মোপদেশ ইত্যাদির কি বন্দোবস্ত আছে জানি না। কিন্তু নূতন স্কুলটি আমাদের জুবিলী স্কুলের দোসর হয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে একটা মহৎ কাজ সাধন করেছে। অর্থসংগ্রহের মতো হতভাগা কাজ করতে করতে একদিন আমি সেন মশায়কে একটা ফ্যাসাদে ফেলেছিলাম, যখন আমি বললাম, "স্যর নৃপেন্দ্র সরকার আপনার অতিথি হয়েছেন একটা মামলার অজুহাতে — আমি কিন্তু ঠিক করেছি তাঁর এখানকার একদিনের ফি এই মেয়েদের স্কুলের সাহায্যে আদায় করবো।" সেন মশায় একটু অসন্তুষ্ট হলেন, কিন্তু আমাকে তিনি 'না' বলতে পারতেন না — তাই বললেন, "আমি এই স্কুলের প্রেসিডেন্ট, নৃপেন সরকার আমার নিজের অতিথ — কি করে অতিথির কাছ থেকে টাকা নেবে ?" আমি বললাম, "আমি আপনার অনুপস্থিতিতে এঁর কাছে আসবো — আপনি জানতেও পারবেন না।" তিনি সন্তুষ্ট হলেন না, কিন্তু আর কিছু বললেন না — আমিও একদিন গিয়ে স্যর নৃপেন্দ্র সরকারের অর্ধেক দিনের রোজগার নিয়ে এলাম। বোধহয় তার পরের বৎসরই পাটনার বিখ্যাত ব্যারিস্টার পি. আর. দাশ (চিত্তরঞ্জন দাসের ছোট ভাই প্রফুল্লরঞ্জন দাশ) লখনৌ এসেছিলেন মামলার সুবাদে — আমি তাঁর কাছ থেকেও একদিনের পুরো ফি নিয়ে এসেছিলাম।

এর কয়েক বৎসর পর ১৯৩৮ সনে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু[১]

---

১. ১৯২০-২১ সালে লণ্ডনে প্রায় প্রতিদিনই "সেক্সপিয়ার হাটে" সুভাষ বাবুর সঙ্গে আর তাঁর প্রিয়বন্ধু দিলীপ রায়ের সঙ্গে দেখা হতো। তাঁর সিভিল সার্ভিস্ ছাড়বার বিষয়ে আমি অনেক আলোচনা তাঁর সঙ্গে করেছিলাম। লখনৌতে আমার অতিথি হয়েই তিনি আমাকে অতি মিষ্টভাবে বললেন যে, যখন দিনে অথবা রাত্রে আমরা আহার করবো তখন তাঁর রীতি অনুসারে যত লোক দেখা করতে আসবেন সেই সময়ে, সকলেই একসঙ্গে খেতে বসবেন —

লখনৌতে এসে আমার অতিথি হয়েছিলেন — আমি তাঁকে আমাদের জুবিলী গার্লস্ স্কুল দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম। তখনও স্কুলের আপন বাড়ী হয়নি। বলাবাহুল্য স্কুলের কর্তৃপক্ষরা, শিক্ষয়িত্রীরা এবং ছাত্রছাত্রীরা সকলেই নেতাজীকে দেখবার সুযোগ পেয়ে ধন্য হয়েছিল। নেতাজী তখন শিক্ষার বিষয়ে কিছুটা উদাসীন — বৃটিশদের কি করে তাড়াবেন এই তখন তাঁর জীবন-মরণ সমস্যা। তবুও বাংলার বাইরে বাঙালীদের সমবেত প্রচেষ্টা দেখতে তিনি রাজী হলেন। বঙ্গের বাইরে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে শুনে তিনি বিশেষ আকৃষ্ট হলেন — মাতৃভাষাতেই সর্বসাধারণের উন্নতিসাধন সম্ভব এ কথা মানতে কেউ দ্বিধা করবে না। মাতৃভাষার প্রচার হোক, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান হোক, এটা যেমন আমরা চাই তেমনি এটাও অপরিহার্য, যে যে-দেশে থাকবে তাকে সেই দেশের ভাষায় কথা বলতে হবে। এটা কেবল ভদ্রতা নয়, এটা ভারতীয় কৃষ্টির একটা অঙ্গ। এই সব চিন্তা করে আমরা হিন্দি ভাষাকে আমাদের স্কুলের শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে 'অবশ্য শিক্ষণীয়' হিসাবে তখনই গ্রহণ করেছিলাম। যখন ১৯৪০ সনে বেশী লোক মাতৃভাষার আন্দোলন আরম্ভ করেননি তখন আমরা এদিকে অগ্রসর হই। হিন্দির জন্য একটা আলাদা পূর্ণাঙ্গ পরীক্ষাপত্র "অবশ্য পাঠ্য" বলে আরম্ভ করা হলো। কিন্তু আজ আমরা দেখছি দেশে দেশে মাতৃভাষার গরিমায় বেশীর ভাগ রাষ্ট্র অন্যপ্রদেশের ভাষাকে আমল দিচ্ছে না। সতেরো বৎসর পর লখনৌতে স্কুলে গিয়ে দেখি বাংলা ভাষার চর্চা স্কুল থেকে প্রায় উঠে গিয়েছে। তার কারণ আসল বার্ষিক পরীক্ষার মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষা পরিগণিত হচ্ছে না। আমাদের ত্রিশ বৎসরের চেষ্টাকে প্রদেশ

তিনি বললেন যে এই বন্দোবস্তের আব্দারটুকু আমাকে রাখতেই হবে। বলা বাহুল্য, কোনোবেলাই ত্রিশ থেকে চল্লিশ জনের কম হয়নি। তখন তিনি গান্ধীর অপ্রিয়ভাজন, অন্যদিকে গভর্ণমেণ্টের ঘোর শত্রু কিন্তু জনসাধারণের অতিপ্রিয়।

সরকার নির্মূল করে দিয়েছেন। বাংলা দেশে একটা উচ্চ আদর্শ এখনো আছে — বাংলা দেশে অনেক স্কুল কর্মকর্তাদের নিজেদের ভাষার মাধ্যমে চলেছে — বাঙালী এখনো বিশেষ কোনো প্রতিবাদ শুরু করেনি — উদার দৃষ্টিতে মাতৃভাষাকে সমর্থন করছে — অন্যপ্রদেশ সংকীর্ণ মনে নিজের দেশের ভাষা ছাড়া অন্য ভাষার মাধ্যম মেনে নিচ্ছে না। 'মাধ্যম' না মানলেও অন্য বন্দোবস্ত সরকার করতে পারেন, যাতে মাতৃভাষার প্রয়োজনীয়তা রক্ষিত হয়। এ বিষয়ে বাঙালী নেতাদের দৃষ্টি রাখা দরকার, তবেই তো উত্তরপ্রদেশের সংস্কৃতি বাংলা-ভাষার সাহিত্যে আসবে। অতুলপ্রসাদ নেই, প্রমথ তর্কভূষণ নেই, কেদারবাবু নেই, লালগোপাল মুখোপাধ্যায় নেই, সুরেন সেন নেই, কিন্তু তাঁদের স্থান (লখনৌতে, কাশীতে, এলাহাবাদে, কানপুরে) যাঁরা অধিকার করছেন তাঁদের সম্মিলিত চেষ্টায় উদ্দেশ্য সফল হতে পারে।

অতুলপ্রসাদ ও পূর্বসূরিগণ

যাঁরা লখনৌর গত দেড়শো বৎসরের ইতিহাস কিছুমাত্র অবগত আছেন তাঁরাই জানেন, লখনৌর সঙ্গে কতিপয় সাহসী বাঙালী কি ভাবে আউধের রাষ্ট্রজীবনের ও সমাজজীবনের উত্থানের সঙ্গে জড়িত। কেবল লখনৌ নয় — এলাহাবাদ, কানপুর ও কাশীর জীবনের সঙ্গেও জড়িত। বৃটিশরা যখন এ সব স্থানকে আয়ত্বের মধ্যে আনছেন তখন পতনোন্মুখ হিন্দু উচ্চশ্রেণীরা ও মুসলমান নবাব বাদশারা বিলাসিতায় ও চরিত্রের দীনতায় অধঃপতিত। এই সময়ে কয়েকজন সাহসী, চিন্তাশীল, উন্নতমনা, সুকৌশলী বাঙালীর সহায়তা রাজা বাদশারা পেয়েছিলেন — কয়েক ক্ষেত্রে তাঁরা ইংরাজ পক্ষকেও সাহায্য করেছিলেন দেশের জনসাধারণের উন্নতির উদ্দেশ্যে। এই চারটি

জায়গাই ঐতিহাসিক ঘটনায় পূর্ণ। কিন্তু তবুও এ কথা মানতে হবে যে, লখনৌর ইতিহাসের যেমন একটা বিশেষ রূপ আছে তেমনটি অন্য জায়গায় নেই। রসিক বাঙালীর পক্ষে লখনৌর স্মৃতি ও মাধুর্য অন্য রকমের — অনেক সময়ে মনে হয় যোগটা কেবল ঐতিহাসিক নয়, যেন আত্মিক। মনে পড়ে, লখনৌর সর্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী বাদশাহ ওয়াজিদ আলি শাহ্[1] (১৮২২—১৮৮৭)-এর কথা — যিনি প্রথম যৌবনে চৌত্রিশ বৎসর বয়সে কলকাতায় (মেটিয়াবুরুজে) এসে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মেটিয়াবুরুজে কাটিয়ে অন্তিম বিদায় নিয়েছেন, এবং স্বীকার করতে বাধা নেই যে তাঁর সঙ্গে বাংলার অন্তরের প্রীতির সম্বন্ধ জন্মেছিল, যদিও আউধের অধীশ্বর বাঙালীদের সমাজ-জীবনের সঙ্গে সুপরিচিত[2] হয়েছিলেন বলে কোনো উল্লেখ পাইনি,

---

১. লখনৌ-ঠুংরীর ইনিই প্রবর্তক — তাছাড়া নৃত্যকলায় সুপটু ছিলেন — কাল্‌কা বিন্ধা দু-ভাই-এর নাচের গুরু নবাব ওয়াজিদ্ আলি।

নৃত্যরসিকদের মুখে শুনেছি যে তাঁকে একদিন বাগবাজারের পশুপতি বসু নিমন্ত্রণ করেছিলেন দোলের দিন রাত্রে। গান বাজনার পর সকলের অনুরোধে বাদশার নৃত্য পুরো-ঘর-ভরা আবিরের উপর বিছান মস্‌লিনের উপর। মস্‌লিন তুলে নিলে দেখা গেল রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি অঙ্কিত হয়েছে — স্থুল শরীর থাকা সত্ত্বেও পায়ের আঙুলের এত সূক্ষ্ম কাজ সম্ভব হয়েছিল। এটা বৃদ্ধ রসিকদের মুখে শোনা কথা।

২. মেটিয়াবুরুজের প্রাসাদ ছেড়ে বাঙালীদের সঙ্গে কতটা মিশতে পেরেছিলেন তার উল্লেখ পাইনি, কিন্তু গঙ্গা পার হয়ে বোটানিকেল গার্ডেন্‌সে বহুসংখ্যক উর্দিপরা দেহরক্ষীদের নিয়ে তখনকারকালের কারুকার্যখচিত প্রশস্ত রিক্সাতে তিনি ঘুরে বেড়াতেন (প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে যে-রিক্সাতে মহারাজা বর্ধমান, মহারাজা কুচবিহার, লর্ড সিংহ, স্যর নীলরতন সরকার, স্যর আর. এন. মুখার্জি দার্জিলিং-এর ম্যালেতে বেড়াতেন) আর বাঙালীদের সঙ্গে গল্প, আলাপ করতেন।

তবুও বাংলাদেশে তাঁর সুদীর্ঘ অবস্থিতি আমাদের মনকে তাঁর প্রতি অনুরাগী করে তোলে এবং তাঁর কবিত্ব ও কলাগুণের পরিচয় আমাদের মনকে অপূর্ব বর্ণচ্ছটায় রাঙিয়ে দেয়, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মহানুভবতায় ও আত্মোৎসর্গে গভীর শ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলে। এখনো কি বলবো না যে লখনৌ-কলকাতা সেই সময়ে একটা অদৃশ্য প্রীতির বন্ধনে গ্রথিত হয়েছিল? আবার অন্যদিকে যখন দেখতে পাই কয়েকটি বাঙালী লখনৌতে সিপাহীবিদ্রোহের কিছু পূর্বে আউধের শাসনতন্ত্রের মধ্যে যোগ দিয়ে তাদের বৈষয়িক ও প্রশাসনিক সমস্যাগুলিকে অতি সাহসের সঙ্গে, দক্ষতার সঙ্গে এবং দূরদৃষ্টির সঙ্গে সমাধান করতে সক্ষম হয়েছিলেন — তখন কি বলবো না যে লখনৌ-কলকাতা পারস্পরিক মৈত্রীবন্ধনে ইতিহাসের যেটুকু স্থান অধিকার করেছে সেটুকুও লখনৌ ও কলকাতার চিরস্মরণীয় সম্পদ হয়ে থাকবে? বাঙালীর আত্মশ্লাঘা অমার্জনীয় নয়, যখন দেখা যায় একটি বাঙালীর কৃতিত্ব — যাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে অযোধ্যা-লখনৌর রাজনীতিতে ও সমাজ-সংগঠন ক্ষেত্রে। তাঁর নাম রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। ইনি সিপাহী-বিদ্রোহের পরই লখনৌ এসেছিলেন। কিন্তু আর একজন বাঙালী কর্মবীর ও রাজনীতিজ্ঞ বাদশা-বৃটিশ কূটনীতির মধ্যে পড়েছিলেন — তাঁর নাম কালীনাথ চট্টোপাধ্যায়। ইনি সিপাহী-বিদ্রোহের বিপদ-সঙ্কুল অবস্থার মধ্যে কিছুকালের জন্য জড়িয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু শেষে অতি কৌশলে ও বুদ্ধিমত্তায় সমস্ত বিপদ পার হয়ে জীবনরক্ষা করেছিলেন। ইনি যে-ভাবে লখনৌ, কানপুর, অযোধ্যাতে আত্মগোপন করে আবার ধরা পড়ে, পুনরায় নিষ্কৃতি লাভ করলেন, ঐতিহাসিক ছাড়া তার বিশদ বর্ণনা সম্ভবপর নয়। এঁরা অযোধ্যা-লখনৌর নবাব-বাদশা, রাজা-মহারাজাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন এবং তাঁদের উন্নতির জন্য কেবল আত্মনিয়োগ করেননি — আত্মোৎসর্গও করেছেন। এঁরা নিজেদের পৌরুষ

দেখিয়েছেন যখন সেখানকার তদানীন্তন সমাজ বাত্যাবিক্ষুব্ধ। বৃটিশরা চেষ্টা করেছে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে নূতন সমাজচিন্তা দিয়ে, নূতন সংগঠন নীতি দিয়ে — সেইক্ষেত্রে তাঁদের সহকর্মী ও প্রতিদ্বন্দ্বী একমাত্র বাঙালী (দু'একজন মারাঠার নামও পাওয়া যায়)। এঁদের পরের যুগে দেশীয় তালুকদার রাজারা শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভাবে শির নত করে শান্ত ভাবে বৃটিশদের আদেশ অনুবাহী ছিলেন মাত্র। পরের যুগে যেসব বাঙালীরা এলেন তাঁদের মধ্যে পূর্বসূরিগণের সাহসও ছিল না, কর্মদক্ষতাও ছিল না — ছিল কেবল ব্যবসা অনুযায়ী কর্মকুশলতা — পরে এলেন নবীন মিত্র, রামলাল চক্রবর্তী, নগেন ঘোষাল, মহেন্দ্র-লাল ওহদেদার, মন্মথ লাহিড়ী ইত্যাদিরা। তাঁরা তাঁদের সুনাম রেখে গেছেন, কিন্তু লখনৌর সমাজজীবনে বিশেষ কিছু স্থায়ী দান রেখে যাননি — জীবনের সফলতা অর্জন করা ছাড়া। একজন অখ্যাত লোক কিন্তু লখনৌকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসে চিরকালের জন্য নামাঙ্কিত করে গেলেন তার দান দিয়ে — এঁর নাম বিশ্বনাথ রায় (Bissonath Roy), যাঁর নামে এখন বি. এন. রায় ট্রাস্ট আছে। শুনেছি দানগুলি অকিঞ্চিৎকর হলেও সম্পত্তির বর্তমান মূল্য প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা। এই ধারার শেষ স্মরণীয় পুরুষ অতুলপ্রসাদ সেন, যদিও তাঁকে আমরা কর্মবীর বলতে পারি না। দক্ষিণারঞ্জনের দীপ্তিমান্ মনুষ্যত্বের কাছে, কর্মদক্ষতায়, সমাজসংস্কারে, দানে, মানে, নির্ভীকতায় সকলের দীপ্তিই নিষ্প্রভ হয়ে যায়। অতুলপ্রসাদ তাঁর নিজের চিন্তা ও ক্ষমতা অনুযায়ী ১৯০২ থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত লখনৌর নগরবাসীদের সাধ্যমতো সেবা করেছেন — মুসলমান সমাজ, হিন্দু সমাজ, আর্য সমাজ সকলকেই সমাদরে গ্রহন করেছিলেন — সকলকেই চিরকালের জন্য আপন করে গেছেন তাঁর দানের মধ্য দিয়ে; দানের পরিমাণ বৃহৎ না হলেও সেই ছোট্ট দান কত মহানুভবতা, হৃদয়ের কত ব্যাপকতা প্রমাণ করছে। তাঁর অতুলনীয় উইলের মর্ম দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন মানুষকে কি করে

চিরকালের জন্য আপন করে নেওয়া যায় এবং সেইখানেই জীবনের পূর্ণ সার্থকতা। লখনৌ সহরের উন্নতিকল্পে তিনি গঙ্গাপ্রসাদ ভর্মার সহকারী হয়ে কাজ করেছেন; তারপর অতুলপ্রসাদ সেন নিজেও লখনৌ মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস্-চেয়ারম্যান হয়েছিলেন। অতুল-প্রসাদের পূর্বসূরিগণ [১] যাঁরা সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে এবং পরে অপরিসীম কর্তব্যনিষ্ঠা দেখিয়েছিলেন তাঁদের একটু পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি যাতে বাঙালীরা এবং লখনৌবাসী অবাঙালীরা একটু জানতে পারেন কী দুর্দিনে এঁরা লখনৌর জীবনের সঙ্গে আপনাকে গেঁথে ফেলেছিলেন। এই সবই হলো যোগসূত্র। তাই আমি আনন্দ পাই এই ভেবে যে, বাদশা ওয়াজিদ্ আলি শাহ্ করলেন লখনৌ-ঠুংরী প্রবর্তন, আর পরবর্তীকালে অতুলপ্রসাদ করলেন বাংলা গানে লখনৌ-ঠুংরী প্রবর্তন।

অতুলপ্রসাদ ও আমার পরিচয়

প্রথম সাক্ষাতের পাঁচ-ছয়দিন পর আবার যেদিন গেলাম অতুলপ্রসাদের বাড়ি, সেদিন শুনলাম তাঁর মা আর বোনেরা কলকাতা চলে যাচ্ছেন এবং বেশ কিছুদিনের জন্যই যাচ্ছেন — আরো শুনলাম তাঁর স্ত্রী শীঘ্রই আসছেন কলকাতা থেকে। এই দুটো খবর শুনে আমার মনে একটা সন্দেহ হলো যে সেন মশায়ের পারিবারিক জীবনে বোধহয় কিছু গরমিল আছে। ধীরে ধীরে শহরের অন্যান্য লোকের মুখেও শুনতে লাগলাম যে আমার সন্দেহটা অমূলক নয়। তাঁর মা ও বোনেরা চলে গেলেন।

অতুলপ্রসাদের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হবার কয়েক সপ্তাহ পরই

১. 'পরিশিষ্ট' দ্রষ্টব্য।

তিনি আমার প্রতি বিশেষ ভাবে স্নেহশীল হয়েছিলেন। তার একটা কারণ একদিন চায়ের টেবিলে বসে আমাদের "তেলিরবাগের দাশ পরিবারের" কথা উঠলো — আমি কথায় কথায় বললাম যে আমি এবং আমার মা বাবা রসা রোডে আমার মাসীমার বাড়ীতে থাকতাম, যেটা এখন চিত্তরঞ্জন দাশের বাড়ী হয়েছে। কৌতূহলী হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কী সূত্রে সেখানে থাকতে?" আমি বললাম, আমার মাসীমা দুর্গাসুন্দরী কালীমোহন দাশের পুত্র মনোরঞ্জন দাশের স্ত্রী ছিলেন — এই মাসীমার সম্পর্কেই আমার মামারাও সকলেই যখন ঢাকা থেকে কলকাতা আসতেন তখন এখানেই থাকতেন। আমি ১৯০২ সন থেকে ১৯০৪ সনের মধ্যে তিনবার এই বাড়িতে এসেছি — তখন কালীঘাট অবধিই ট্রামের শেষ প্রান্ত ছিল। বড় হয়ে শুনেছি মাসীমার ছেলে ছিল না বলে এই বাড়ীটা তাঁর হাত থেকে চলে যায়, কারণ তাঁর শ্বশুর মশায় বসন্ত দাশকে (সি. আর. দাশের ছোট ভাই) দত্তক নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনিও অকালে মারা গেলেন। আমার মাসীমা এক মাত্র কন্যা নিয়ে থাকতেন। একটু বুঝতে পেরেই অতুলপ্রসাদ আনন্দে উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, "তবে কি তুমি কুসুমের ভাই? কুসুম আমার প্রায় সমবয়সী ছিলেন — অনেক সময়ে একত্রে কাটিয়েছি — কুসুমের মা কি তোমার আপন মাসী? তুমি আমার পূর্বস্মৃতি জাগিয়ে দিলে — এত নিরানন্দের মধ্যে কত আনন্দ পেয়েছি।" অতুলপ্রসাদ তখন থেকে আমাকে আরও কাছের মানুষ করে ফেলেছিলেন। আমার ধারণা তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কয়েকটি ব্যাপার আমাকেই মাত্র বলেছেন, যখন তাঁর মন ভীষণভাবে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল।

আগেই বলেছি যে অতুলপ্রসাদের মা বোনেরা চলে গেলেন, কিন্তু তারপর সাত আট মাস কেটে গেল কিন্তু সেন মশায়ের স্ত্রী এলেন না। একদিন হঠাৎ শুনলাম সেন মশায়ের মা আবার ফিরে

আসছেন, কারণ তিনি অসুস্থ এবং বিশেষ করে যখন মিসেস্ সেন আসছেন না। ১৯২৪ সালে লখনৌতে আমার প্রথম দুর্গাপূজা। তাই আমি আমার মাকে, মাসীমাকে এবং সমস্ত ভাইবোনদের এনেছিলাম। একদিন আমার অনুরোধে সেন মশায়ের মা বোনেরা আর সেন মশায় নিজে আমাদের জপ্‌লিং রোডস্থ বাড়ীতে এসেছিলেন। সেন মশায়ের মা, (পরের বিয়ের সম্পর্কে) আমার মাসীমার (কালীমোহন দাশের পুত্রবধূ) খুড়ীশাশুড়ী হতেন। আমার মাসীমার মুখে আমি সেন মশায়ের মায়ের অজস্র প্রশংসা শুনেছি — খুব গুণী, কর্মকুশলা মহিলা ছিলেন — বিশেষ করে রোগীর শুশ্রূষা কার্যে অদ্বিতীয়া ছিলেন। আমার মা মাসীর সঙ্গে সেন মশায়ের মা-বোনদের অনেক গল্প হলো — শেষে সেন মশায় দুখানা গান গাইলেন। এর পর অনেকদিন আর দেখা সাক্ষাৎ হবার সুযোগ হয়নি। এর আট ন' মাস পর ১৯২৫ সনের মাঝামাঝি সময়ে সেন মশায়ের মায়ের মৃত্যু হলো — তখন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ — আমরা গ্রীষ্মের ছুটিতে বেড়াতে বেরিয়েছি।

অতুলপ্রসাদ ও সর্বভারতীয় সঙ্গীত সম্মেলন

পয়লা আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয় খুললো। সাহিত্যের আসর ও গল্পের আড্ডা আরম্ভ হলো অন্যত্র। বিকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে আমরা অনেকে টেনিস খেলতাম — রাধাকুমুদবাবু, রাধাকমলবাবু, নির্মল সিদ্ধান্ত, প্রভু গুহঠাকুরতা, ধূর্জটিপ্রসাদ, আমি ইত্যাদি। তারপর বেশীর ভাগ দিন ধূর্জটিপ্রসাদের বাড়ীতেই জমায়েৎ হতাম, তাতে উপরোক্ত সকলে সর্বদা আসতেন না — কেবল রাধাকুমুদ আর আমি থাকতামই, কখনো যোগ দিতেন অসিত হালদার, অসিত গুপ্ত, গিরীন চ্যাটার্জী প্রভৃতি অনেকে। মাঝে মাঝে আমার বাড়ীতে বৈঠক হতো — কানাই গাঙ্গুলী,

উপেন সেন, প্রফুল্ল কাঞ্জিলাল এসে যোগ দিতেন। কখনো আমরা একত্রিত হতাম অসিত হালদারের বাড়ীতে — সেখানে শিল্পী ললিত সেন, হিরণ্ময় রায়চৌধুরী, বীরেশ্বর সেন আসতেন। একদিন শুনলাম যে এবার বড়দিনের ছুটিতে অল্ ইণ্ডিয়া মিউজিক্ কন্ফারেন্স-এর এই প্রথম অধিবেশন হচ্ছে। রাজা নবাব আলি, রাজেশ্বর বালী, উমানাথ বালী ইত্যাদিদের উদ্যোগে বারাদ্বারীতে অধিবেশন হবে। দেখতে দেখতে শহরে মহাসমারোহের শোরগোল আরম্ভ হলো। সেন মশায়ের বাড়ীতে যখন একত্র হতাম তখন তো আসন্ন সঙ্গীত সম্মেলন ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ই বেশী আলোচনা হতো না। ভারতীয় উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের দেশবিখ্যাত গায়কদের এত বড় সম্মেলন আমার কাছে সম্পূর্ণ নূতন। অতুলপ্রসাদ ও ধূর্জটিপ্রসাদ সঙ্গীতবোদ্ধা ও সঙ্গীতরসিক — যে কোনো সঙ্গীত জলশায় আভিজাত্যের গর্ব রাখেন — তাঁদের পক্ষেও এই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সম্মেলন বিশেষ আকাঙ্ক্ষিত — অতুলপ্রসাদতো আগ্রহের সঙ্গে প্রতীক্ষা করছেন — কারণ নিজে সুরকার ও গায়ক। ভারতের সমস্ত বড় বড় ওস্তাদরা (গায়ক ও বাদক) একত্র হবে এবং আপন আপন ঐশ্বর্য উজাড় করে দেবে এটা কি কম উত্তেজনা ? যথাসময়ে কেশরবাগে[১] বারাদ্বারীতে আসর বসলো — অনেক খ্যাতনামা

১. এই সেই কেশরবাগ যেখানে লখনৌ-এর নবাবদের এবং রাজাদের রাজপ্রাসাদ ছত্রমঞ্জিল, ছোটছত্রমঞ্জিল, বারাদ্বারী, নবাব ও বেগমের স্মৃতিসৌধদ্বয়, নবাবের সাড়ে তিনশো বেগমের বাসস্থান — যার ভিতর দিয়ে উত্তর কালে প্রশস্ত রাজপথ বানানো হয়েছে। লখনৌর শেষ ইতিহাস প্রসিদ্ধ নবাব ওয়াজিদ্ আলি শাহ্ ১৮২২-১৮৮৭) যাঁকে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট আউধের মসনদ থেকে সরিয়ে দিলেন এবং বাৎসরিক পেন্সন্ বারো লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে দিলেন। তিনি নিজের ছেলেকে গদিতে বসিয়ে লণ্ডন অভিমুখে রওনা হলেন — কলকাতা এসে জাহাজ ধরবেন বলে। তিনি প্রায় পাঁচ-ছয়শো লোক নিয়ে লখনৌ ছাড়লেন — কলকাতা মেটিয়াবুরুজে এসে কোনো অজানা

ওস্তাদরা আমন্ত্রিত হয়ে এলেন — ফৈয়াজ খাঁ, আলাবন্দে খাঁ, নসির খাঁ, চন্দন চৌবে, আলাউদ্দিন, ফিদা হুসেন, এনায়েৎ খাঁ, বীরু মিশ্র, হাফিজ আলি, মোরাদ খাঁ ইত্যাদিরা এসে তাঁদের কৃতিত্ব দেখিয়ে সমস্ত শ্রোতাদের প্রতি বৈঠকে প্রশংসা অর্জন করলেন।

তিনদিন আমরা খুব উত্তেজনার মধ্যে সময় কাটালাম — অতুলপ্রসাদ প্রথম দিন দোপল্লী টোপী ও আঙ্গারখাঁ, চুরীদার পড়ে

কারণে তিনি নিজে লণ্ডন যাওয়ার ইচ্ছা ছেড়ে দিলেন — নিজের মাকে, ছোট ভাইকে এবং সঙ্গে দু'তিনশো লোক দিয়ে (তার মধ্যে প্রচুর গণ্যমান্য, বিজ্ঞ পরামর্শদাতাও ছিলেন, আবার রঁসুইদার, খিদ্‌মদ্‌গার, আর্দালী, রক্ষীও ছিল) লণ্ডন পাঠিয়ে দিলেন যাতে সেখানে গিয়ে, মা আর ভাই ডালহৌসীর এবং ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ন্যায়বিচারের জন্য সারা ইংলণ্ডময় একটা শোরগোল সৃষ্টি করতে পারেন। শুনেছি, যথেষ্ট পরিমাণে তাঁরা সাফল্য লাভ করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঠিক সেই সময়ে সিপাহীবিদ্রোহ আরম্ভ হলো — মা আর ভাই প্যারিসে পৌঁছে কয়েকদিনের মধ্যেই মারা গেলেন। ওয়াজিদ আলি শাহ্‌র সমস্ত আশা নির্মূল হলো — তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে বড় বড় রাজঅট্টালিকা মেটিয়াবুরুজে তৈরী করলেন — প্রায়ই নৌকায় গঙ্গা পার হয়ে শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের ভিতরে বেড়াতেন। নবাবের খাসমহল বেগম ছিলেন নবাব আলি নাকি খাঁর কন্যা — আবার ওয়াজিদ্ আলি শাহ্ এই আলি নাকি খাঁকেই তাঁর নিজের উজির করেছিলেন — নবাব আমিনদ্দৌলাকে সরিয়ে দিয়ে।

লর্ড ডালহৌসী এই আলি নাকি খাঁকে কলকাতায় ডেকে এনে হাত করেছিলেন এবং এঁকে দিয়েই মসনদ-চ্যুতিপত্র নবাবের হাতে দাখিল করা হয়েছিল। এই সব কারণে আলি নাকি খাঁ দেশের সর্বসাধারণের অত্যন্ত অপ্রিয়ভাজন হন। শোনা যায় বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে যাঁরা নবাবের বিরুদ্ধে লণ্ডনে প্রেরিত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে আলি নাকি খাঁ একজন। এইজন্যই একটি গান লখনৌতে সাধারণ লোকেরা গাইত — যে গান আমি শুনেছি ১৯১৬ সনে ঢাকায়। ঢাকা তো একসময়ে মুসলমান কীর্তির স্থান ছিলই। গানটি এই —

এলেন — ওয়াজিদ আলি শাহ্‌র খাস জলশাঘরে এই তো উপযুক্ত সাজ — লখনৌতে 'ময়ফিল'-এ এই পোষাক পড়ে বড় বড় নবাব, রাজা, তালুকদাররা আসতেন। সারা হিন্দুস্থানের বিভিন্ন ঘরানা আপন আপন বৈশিষ্ট্য দেখালেন — যে সঞ্চয় লুক্কায়িত ঐশ্বর্য বলে গুণীদের কাছে পূর্ণ উদ্যমে পরিবেশন করলেন — চারদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। যাঁরা সঙ্গীত শাস্ত্রে প্রবেশ করেননি, আমার মতো,

ভলা, নিমকহারামনে মূল্‌ক্‌ ডুবায়া
হজরত যাতে হেঁ লণ্ডন কো
মহল মহল মে বেগম রোঁয়ে,
গলি গলি রোঁয়ে পাতুয়িরা।

দ্বিতীয় গানটি যেটা ঢাকায় আমার মামাতো বোন বুলু গাইত —

খাম্বাজ-ঠুংরী

যব ছোড় চলে লখনৌ নগরী,
কহো আহাল আদম্‌ পর ক্যা গুজরী,
আলম্‌ গুজরা সদমা গুজরা,
যব হাম্‌ গুজরে, তুনিয়া গুজরী।

এই গান শুনলে পরিষ্কার ধারণা হয় যে ওয়াজিদ আলি শাহ্‌র মনে একটা আসন্ন বিষাদের ছায়া পড়েছিল যে তিনি বোধহয় চিরকালের জন্য লখনৌ ছাড়লেন। তাই তিনি এই শেষ গান গাইতে গাইতে লখনৌকে কাঁদিয়ে গেলেন — কেশরবাগের ভিতর দিয়ে সেই হাজার নাগরিকদের মিছিল চলেছে — গাইয়ে বাজিয়ে নর্তকীরা ওস্তাদরা ঠুংরী গান গাইতে গাইতে চলেছে — নাগরিকরা গাইছেন "যব ছোড় চলে লখনৌ নগরী ..."। বারোঘোড়াটানা গাড়ীতে বাদশা — সর্বজনপ্রিয় বাদশা — লখনৌ-ঠুংরীর প্রবর্তক বাদশা — সর্বকলাবিৎ বাদশা — নৃত্যচতুর বাদশা — সুশাসক, সুবিচারক বাদশা লখনৌ ছাড়লেন চিরতরে। লখনৌর চৌকের দিকে এখনো নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ্‌র উপরে এই কবিতা শুনতে পাওয়া যায়। আমি গান শুনিনি — আবৃত্তি শুনেছি—

ওয়াজেদ আলী মেরা পেয়ারা
আপ্‌ লণ্ডনকো সিধারা

তাঁরা মার্গ সঙ্গীতের মাহাত্ম্য অনুভব করলেন, কিন্তু মাধুর্যের রসাস্বাদন করতে পারলেন না। তানের পর তান, তানের পর তান, অবিরাম তানের নূতন নূতন অভিযান, নাভীদেশের গভীর অন্তঃস্থল হতে উত্থিত গমক, সিংহ নিনাদের মত প্রতীয়মান হচ্ছিল — তবুও এটা বুঝতে

সরকো সরকো বাস উরাং হায়
গঁলিয়ো মে আধেয়ারা
আপ লণ্ডন কো সিধারা।

কেবল মুসলমান নয় হিন্দুরাও নবাবকে খুব ভালবাসত, তাই অনেক জায়গায় হিন্দুরা প্রথম গানটিতে যোগ করে দিয়েছে "হজরত যাতে হেঁ লণ্ডন কো"র পরে "হাম পর্ কৃপা করো রঘুনন্দন।"

শুনেছি লখনৌতে বাদশার অন্যতম সঙ্গীতশিক্ষক ছিলেন কুতুব-উদ্-দৌল্লা। লখনৌর বিখ্যাত টপ্পা ও খেয়ালিয়া আহ্‌মদ খাঁ, কলকাতার বিখ্যাত বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুরু ধ্রুপদিয়া বাসৎ খাঁ, খেয়ালগায়ক ছোট মিঞা ইত্যাদিরা ওয়াজিদ আলী শাহ্‌র দরবারে গাইতেন। আরও শুনেছি, লখনৌর গুণীদের গাওয়া একটি গান, 'বাবুলা মেরা নৈহার ছুটহি যায়,' — এটির রচয়িতা নাকি বাদশা ওয়াজিদ আলি শাহ্। মেটিয়াবুরুজে বাদশার দরবারে অনেক বিখ্যাত বাঙালী গায়ক আসতেন, যেমন, যদুভট্ট, বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, যদু রায় ইত্যাদি। তাঁর দরবারে ভারতের অন্যান্য স্থান থেকেও ভাল ভাল শিল্পী নিমন্ত্রিত হয়ে আসতেন — গোয়ালিয়ার থেকে আসতেন ধ্রুপদিয়া তাজ খাঁ, আলি বখ্‌স্ (যিনি ধ্রুপদ, খেয়াল ও ধামারের ওস্তাদ ছিলেন), রামপুর থেকে আসতেন ধ্রুপদিয়া সাদিক আলি খাঁ ইত্যাদি। তাছাড়া বাদশা নিজে ছিলেন একজন সাহিত্যিক ও কাব্যরচয়িতা; তিনি লিখেছেন, 'হুজন্-ই-আখ্‌তার', 'তারিখ্-ই-মুমতাজ', 'তারিখ্-ই-পরীখানা'; এছাড়া তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রেমের বর্ণনা দিয়েও একটি উর্দু কাব্য রচনা করেছিলেন।

অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন বাদশা লখনৌতে দীর্ঘকাল রাজত্ব করতে পারলে (তাঁর রাজত্বকাল '৮৪৭-৫৬) লখনৌ সত্যিই ইন্দ্রপুরী হয়ে উঠতে পারতো। আমাদের অদৃষ্ট, তখনকার বৃটিশ বেনেরা তাঁর কদর দিতে পারলো না।

পারছিলাম যে এক অনির্বচনীয় শাস্ত্র-বিজ্ঞান মন্থন হচ্ছিল। বুঝতে পারছিলাম, ধূর্জটিপ্রসাদ কিছু নূতন, কিছু পূর্ব পরিচিত রাগের সঙ্গ পেয়ে বেশ আনন্দ পাচ্ছেন, তবে আমার মনে হয়েছে অতুলপ্রসাদ সঙ্গীতবিজ্ঞানের উচ্চমানের বৈচিত্র্য দেখে আনন্দও পেয়েছেন উত্তেজনাও যথেষ্ট পেয়েছেন, কিন্তু তিনি সৃষ্টির উদ্দীপনা খুব কমই পেয়ে থাকবেন — এই আমার নিজের ধারণা। আমাদের মতো সঙ্গীত অনভিজ্ঞদের আনন্দ এই যে, যে-সামগ্রী অনেক সাধনায় পাওয়া সম্ভব, তা প্রাচুর্যের সঙ্গে পরিবেশিত হয়েছিল — এটা আমাদের সুবর্ণ সুযোগ। সঙ্গীতসাগর ভাতখণ্ডেজী এবং তাঁর শিষ্য শ্রীকৃষ্ণরতনজানকারকে এই প্রথম দেখলাম; কিন্তু অনুপস্থিত ছিলেন বড়দের মধ্যে আর এক সঙ্গীতসাগর বিষ্ণু দিগম্বর — আমি কলকাতায় ইনস্টিটিউট হল্-এ তাঁর গান শুনেছি। আবার লখনৌতে পরের বৎসরও (১৯২৬ এর প্রথমে) এই সম্মেলনের অধিবেশন হয়েছিল। তখনও খুব জাঁকজমকে সেই সব গুণীব্যক্তিরা এসেছিলেন। এবার বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন বিখ্যাত ধ্রুপদিয়া রাধিকা গোঁসাই — গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি। দেশে ফিরে এসেই রাধিকা গোঁসাই খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং মারা গেলেন।

অতুলপ্রসাদ ও প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন

আমি লখনৌ আসবার পর থেকেই শুনেছিলাম প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ১৯২৩ সনের কাশীতে প্রথম অধিবেশন খুব সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। সম্মেলনের মুখপত্র হিসাবে একটি মাসিক পত্রিকা কাশী থেকে শীঘ্রই প্রকাশিত হবে বলে আলোচিত হয়েছিল — সম্পাদক হবেন অতুলপ্রসাদ সেন আর সহ-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র

চক্রবর্তী। সুরেশচন্দ্রের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত হয়েছিলাম। ১৯২৫ সনে সেই মাসিক পত্রিকা "উত্তরা" প্রকাশিত হলো এবং সুরেশ চক্রবর্তীর অধ্যবসায়ের গুণে পত্রিকাটি সাহিত্যক্ষেত্রে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করতে লাগলো। এই পত্রিকা পরিচালনায় আমার দায়িত্ব না থাকলেও সম্পাদকদের মধ্যে আলাপ আলোচনায় আমি প্রায়ই উপস্থিত থাকতাম। একদিকে পত্রিকাটির খ্যাতি বাড়ছে অন্যদিকে তার আর্থিক অবস্থা কঠিন হতে কঠিনতর হচ্ছিল। সেন মশায় প্রয়োজনের গুরুত্বে আর্থিক সাহায্য করতেন --- অবশেষে সেন মশায়ের পক্ষে পত্রিকার পরিচালনায় আর্থিক ঘাটতি একা বহন করা অসম্ভব হয়ে উঠল, কিছুটা নিজের অসুস্থতার জন্য কিছুটা অন্যান্য ভাবনা-চিন্তার চাপে। এই অবস্থায় সম্পাদকেরা পত্রিকাটির গুরুভার সম্পূর্ণভাবে সুরেশচন্দ্রের উপর ন্যস্ত করলেন, অর্থাৎ সুরেশচন্দ্রের উপরে পড়লো পত্রিকার আয় বাড়ানো অথবা ব্যয় কমানোর কাজটা। সুরেশচন্দ্র অনন্যোপায় হয়ে এর সব দায়িত্ব নিজে বহন করতে লাগলেন। ত্রিশবৎসরকাল গৌরবের সঙ্গে পত্রিকাটি চালিয়ে তিনি এখন কর্মক্ষেত্র থেকে সরে গিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন। "উত্তরা"র জন্ম কালের প্রথম কয়েক বৎসর অতুলপ্রসাদ ছিলেন পত্রিকার প্রাণ এবং তাঁরই জন্য রবীন্দ্রনাথ অকাতরে আপন লেখা দিয়ে গেছেন — "উত্তরা" রবীন্দ্রনাথের রচনা প্রকাশে ধন্য ও সমৃদ্ধ হয়েছে। বহির্বঙ্গের অনেকেই "উত্তরা"র পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। "উত্তরা"তে অতুল-প্রসাদের দান প্রচুর, আবার এটাও তেমনি সত্য যে "উত্তরা"ই সেন মশায়কে সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত করেছে এবং তাঁর গানগুলি সমস্ত প্রদেশে ছড়িয়ে দিয়েছে — গানের জনপ্রিয়তা অনেক বেড়ে গেছে। "উত্তরা"র খ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে অতুলপ্রসাদের খ্যাতি দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়লো। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হলো কাশীতে ১৯২৩ সনে — কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে, তার পরের

বৎসর হলো কানপুরে, তার পরের বৎসর লখনৌতে — তখন এগুলি যথেষ্ট উদ্দীপনার মধ্যেই অনুষ্ঠিত হতো দেখেছি — সর্বদাই অনুভব করতাম চারধারে নূতন জীবনের একটা স্পষ্ট সাড়া। ক্রমে ক্রমে এ অধিবেশনগুলি সমস্ত ভারতে ছড়িয়ে পড়লো — বাঙালী অবাঙালী সকলেরই সহযোগিতা পাওয়া গেল — এখনো প্রতিবৎসর সম্মেলন হচ্ছে, কিন্তু জীবনসংগ্রাম ইদানীং এত কঠোর হয়েছে যে সেই পূর্বেকার উৎসাহ ও আনন্দ এখন অনেক পরিমানে হ্রাস পেয়েছে। সাহিত্যা-কাশে জ্যোতিষ্কেরও বোধ হয় অভাব হয়েছে। বর্তমানের সাহিত্যিকেরা নিশ্চয়ই এই অভাব দূর করবেন।

অতুলপ্রসাদের বাড়ীতে গানের জলসা

লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয় শুরু হবার পর (১৯২২) কয়েকজন বাঙালী প্রোফেসর সেন মশায়ের সান্ধ্যসঙ্গী হলেন নিয়মিতভাবে। কিন্তু তার আগে অতুলপ্রসাদের কেশরবাগের বাড়ীতে মজলিশ বসতো সময় সময় বিশেষ কোনো উপলক্ষে। শুনেছি সেগুলিতে উপস্থিত থাকতেন সত্যকুমার মুখার্জি, নির্মল দে, বিজন ব্যানার্জি, শম্ভু চৌধুরী, শৈলেন সান্যাল, দ্বিজেন সান্যাল[১], পাহাড়ী সান্যাল, বরেন সান্যাল ইত্যাদিরা। এদের মধ্যে দ্বিজেন সান্যাল ও পাহাড়ী সান্যাল ভাল গাইতেন এবং অতুলপ্রসাদের প্রতি এবং তাঁর গানের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন — দ্বিজেন সান্যাল তিন চার বৎসর বিলেত থাকাতে মেশামেশি কিছু কম হয়েছিল — বরেন এবং শৈলেন সান্যাল তবলা

১. দ্বিজেন সান্যালের একটা প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল সেন মশায়ের প্রতি ; তিনি পরে একটি সংস্থা গড়লেন "অতুলসেবাদল" — এই দলটি সহরে অনেক সাহায্য ও উপকার করেছে।

বাজাতেন। সেন মশায়ের বিশেষ দৃষ্টি ছিল পাহাড়ী সান্যালের উপর, কারণ তার গলাটি বেশ পরিষ্কার ও মিষ্টি ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালীরা যখন আসরে আসতে লাগলেন, সেন মশায়ের জীবন তখন ততই সরস হতে লাগলো, কারণ বয়সে অনেকেই তাঁর সঙ্গে মেশবার যোগ্য ছিলেন, যেমন, রাধাকুমুদ মুখার্জি, রাধাকমল মুখার্জি, নির্মল সিদ্ধান্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ, অসিত হালদার, হিরণ্ময় রায়চোধুরী, ললিত সেন, বীরেশ্বর সেন ইত্যাদিরা।

কলকাতা থেকে যখন আত্মীয়রা অথবা বিশেষ পদস্থ বন্ধুরা লখনৌ আসতেন তখন তাঁর বাড়ীতে বড় ঘরোয়া বৈঠক বসতো। তখন ব্যারিস্টার হেমন্তকুমার ঘোষ, ব্যারিস্টার সুধীন দাশ, ডঃ বিরাজ গুপ্ত, ডঃ সুবোধ সেনগুপ্ত, সাধন বোস, বীরেন রায়, সত্যকুমার মুখার্জি, চপলা ঘোষ, বুলবুলি দাশ, রাণী নিরুপমা, ইন্দিরা রায়, জুবিলীর কিছু কিছু শিক্ষয়িত্রী আর আমরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বন্ধুরা মিলিত হতাম। আমাদের গৃহিণীরাও খুব আনন্দের সঙ্গে যোগদান করতেন বিশেষ অধিবেশনে। যখন প্রভা আয়াঙ্গার থাকতেন, তিনি তাঁর ছেলে অমর, কুন্তী, রমলা, এবং সময় সময় শেষাদ্রী আয়াঙ্গারও আসতেন। যখন হিরণ আয়াঙ্গার থাকতেন তখন তিনি এবং তার কন্যা সীতাও থাকতেন। যখন অমল হোম লখনৌ আসতেন তখন তিনি আমার বাড়ীতেই থাকতেন এবং এমন সৌখীন মিশুক লোককে পেয়ে সেন মশায়ের আনন্দের অবধি থাকত না। যখন দিলীপ রায়, কমিশনার বি. সি. সেন আসতেন তখন বেশীর ভাগ সময় অতুলপ্রসাদের সঙ্গেই থাকতেন — তখন তো প্রতিদিনই আমি, ধূর্জটিবাবু, রাধাকমলবাবু থাকতাম। কখনো কখনো নির্মল সিদ্ধান্ত ও চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত থাকতেন। সাহানা দেবী যখন আসতেন তখন তো চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত আসতেনই। আমরা দিলীপ রায়কে আর সাহানা দেবীকে একত্রে

খুব কমই পেয়েছি — একত্র পেলে তখন জলসার রূপ বদলে যেতো — তখন শহরের গানের রসিকরা এবং পদস্থ[1] অনেক বন্ধুবান্ধবরাও আসতেন। যখন দিলীপ রায় ডঃ জয়গোপাল মুখার্জির অতিথি হতেন, তখন দিলীপ রায়ের সঙ্গে হঠাৎ কখনো দেখেছি প্রোফেসর নিক্সনকে (যিনি কৃষ্ণপ্রেম নামে খ্যাত), কখনো আলেক্জেনডারকে (যিনি আনন্দপ্রিয়[2] নামে খ্যাত)।

কলকাতার ষ্টোর রোডের বাড়ীতে গরমের বন্ধে, কখনো কখনো বড় দিনের বন্ধে এবং অন্যান্য ছুটিতেও বেশ বড় জমাট আসর বসতো, যার মধ্যে সর্বদাই (১৯২৮ এর পূর্ব পর্যন্ত) থাকতেন দিলীপ রায়, তকু মামা (কে. এন. মজুমদার), রেনুকা, টুলু, কনক, ঊষা, খোদনবাবু, কুণাল সেন, বিনয় ঘোষ, কুমুদেশ সেন, সুবালা মাসী এবং কখনো কখনো বোনরা আসতেন যদি কলকাতায় থাকতেন। অন্যান্য বন্ধুবান্ধব এবং সঙ্গীত রসিকরাও থাকতেন। দিলীপ রায়ের গান, সেন মশায়ের গান এবং রেনুকা ও কনকের গান একটা তুমুল আনন্দের ঝড় বইয়ে দিত।

লখনৌতে প্রায় রবিবারই ছোটখাট বৈঠক হতো — সেটা আসলে ঘরোয়া বৈঠক। বেশ বড় জলশা বছরে তিন-চারবার হতো এবং সেগুলি ভারতীয় উচ্চাঙ্গ শাস্ত্রসঙ্গীতের বৈঠক। যখন কোনো বিখ্যাত গাইয়ে, হয় রামপুর থেকে অথবা গোয়ালিয়র থেকে,

---

১. বীরবল সাহানী (পাঞ্জাবের ব্রাহ্ম), গিরীন্দ্রনাথ গুহদেদার, জি. সি. দাশ, অনিল ব্যানার্জি, বসন্ত ঘোষাল, নলিন হালদার, গোপী ব্যানার্জি প্রভৃতি।

২. কৃষ্ণপ্রেম ও আনন্দপ্রিয় দুজনই কৃষ্ণভক্ত হয়েছিলেন এবং যশোদা মায়ের শিষ্য হয়ে আলমোড়ায় একটি সুন্দর আশ্রম তৈরী করেছিলেন। যশোদা মা (আমাদের প্রথম ভাইস-চ্যানসেলর জ্ঞান চক্রবর্তীর স্ত্রী মনিকা দেবী, যিনি গাজীপুরের সিদ্ধ সাধু পাওয়ারী বাবার শিষ্যা ছিলেন কুমারী অবস্থা থেকেই) শেষ বয়সে স্বামীর অনুমতি নিয়ে সন্ন্যাসিনী হয়ে এই আশ্রমে ছিলেন।

অথবা হায়দ্রাবাদ, মথুরা, ইন্দোর, কাশী, কলকাতা থেকে আসতেন অথবা আবুল করিম আসতেন তখনই সেন মশায়ের বাড়ীতে একটা বৈঠক হতো। কখনো কখনো ভাতখণ্ডেজীকে পেয়েছি, শ্রীকৃষ্ণরতন-জানকারতে তো সর্বদাই পেয়েছি। বাইরে থেকে আসা ওস্তাদদের বৈঠকে সেন মশায়ের বেশ খরচ হতো। কখনো কখনো অন্যত্রও জলশা হতো, যেমন রাজা নবাব আলির বাড়ী, সেলিমপুরের বাড়ী, রাজেশ্বর ও উমানাথ বালীর বাড়ী, অথবা অন্য কোনো সঙ্গীতরসিকের বাড়ী। এক রবিবার সকালে একটি বড় আসর বসবে বলে জানানো হলো — শ্রীকৃষ্ণ প্রাণ খুলে একটি গানই চল্লিশ মিনিট গাইলেন —

ভবানীদয়ানী মহিষাসুর মরদনী……

সকলের মন ভরে গেল — আরও দুতিনখানা ছোট গান হলো — দুঘণ্টার উপরে সময় কাটলো — চমৎকার লাগলো। পরের দিন সন্ধ্যাবেলা আমি আর ধূর্জটিবাবু ধীরে ধীরে সেন মশায়ের কক্ষে প্রবেশ করলাম। তিনি বিশেষ আনন্দে স্বাগত জানালেন এবং তারপর শোনালেন যে-গানটি তিনি সদ্য লিখেছেন, "ভবানীদয়ানী"র অনুকরণে—

সে ডাকে আমারে, বিনা সে সখারে
রহিতে মন না রে, সে ডাকে
প্রভাতে যারে দেখিবে বলি, দ্বার খোলে, কুসুম কলি'
কুঞ্জে ফুকারে অলি, যাহারে বারে বারে…

ভৈরবীর মধ্যে একটু বিশেষ ঢং লাগিয়ে গানটিকে কি মনোমোহকর করে তুললেন। বাংলাভাষায় নূতন ঢং-এ ও মিশ্রণে অতুলপ্রসাদের অনেক গানই এ রকম মিষ্টত্ব এনেছে। এভাবে অনেক গানের জন্মক্ষণের সঙ্গে আমরা বিশেষভাবে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলাম। ধূর্জটিপ্রসাদ সঙ্গীতবিজ্ঞানের সঙ্গে সুপরিচিত এবং তিনি পূর্বে মিশ্রণবিরোধী ছিলেন কিন্তু সেন মশায়ের এবং রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় সঙ্গীত উপাসকদের স্বাধীনতা মেনে নিয়েছিলেন। তাই

তিনি লিখেছেন, "তাঁর (অতুলপ্রসাদের) সুকুমার রচনায় আমরা ঠুংরী, গজল, কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালীর সঙ্গে হিন্দুস্থানী রাগরাগিনীর সুন্দর সম্বন্ধ অনুভব করি।"

অতুলপ্রসাদ ও তাঁর স্ত্রী

মায়ের মৃত্যুর কিছুদিন পরও অতুলপ্রসাদ আউটরাম রোডের বাড়ীতেই ছিলেন। আমি একদিন তাঁর সঙ্গে বৈকালে দেখা করলাম। দুতিনদিন পর আমাকে দেরাদুনে যেতে হয়েছিল — আমি সেবার উত্তরপ্রদেশ সরকারের শিক্ষাবিভাগের পক্ষ থেকে ডুন-স্কুল পরিদর্শন করতে নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। দিনের কাজ শেষ করে সন্ধ্যাবেলা দেরাদুন স্টেশনে লখনৌ ফেরবার জন্য ট্রেনের টিকিট কিনতে গিয়েছিলাম! হঠাৎ দেখতে পেলাম প্ল্যাটফরমে সেন মশায় পায়চারী করছেন — আমি হক্‌চকিয়ে গেলাম, বললাম, "মিঃ সেন, হঠাৎ বুঝি ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে এসেছেন? কবে এলেন? না, হঠাৎ মুসুরী যাবার জন্য এসেছেন?" তিনি বললেন, "না, হঠাৎ কর্নেল জ্যোতিলাল সেন আমাকে টেলিফোনে খবর দিলেন" — এই বলেই তিনি যেন ইতস্ততঃ করতে লাগলেন — পরিষ্কার করে কিছুই বলছেন না — আমি চিন্তিত হলাম, একটু উৎসুকও হলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হয়েছে, আমি বুঝতে পারছি না।" তিনি বললেন, "না, তেমন কিছু নয়, মিসেস্ সেনের অবস্থা খারাপ হয়েছিল — ভয়টা কেটে যাবার পর কর্নেল জ্যোতিলাল আমাকে বলেছেন মিসেস্ সেনকে লখনৌ নিয়ে গিয়ে কয়েকমাস ভালভাবে চিকিৎসা করতে হবে — তাই ট্রেনের স্পেশাল বন্দোবস্ত করতে এসেছি।" শুনে নিশ্চিন্ত হলাম — মনে আনন্দ হলো, আর ভাবলাম সেন মশায়ের

অশান্তির দিন বোধহয় শেষ হলো। লখনৌতে ফিরে গিয়ে প্রায় এক সপ্তাহের পর সেন মশায়ের বাড়ী গিয়ে দেখি খুব সেবা-যত্নের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসা চলেছে—লখনৌর বড় বড় ডাক্তার, ভাল ভাল নার্স আসছেন যাচ্ছেন — বন্ধুবান্ধবেরা খোঁজখবর নিচ্ছেন। যে-মহিলাটি সমস্তদিন রোগীকে বিশেষ তত্ত্বাবধানে রেখেছেন তিনি অতুলপ্রসাদের কনিষ্ঠা সহোদরা প্রভা আয়াঙ্গার। এভাবে তিন-চার মাস কেটে গেল — মিসেস্ সেনও ধীরে ধীরে আরোগ্যের পথে এগিয়ে এসেছেন। চারধারেই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস। আমরা সকলেই সদাসর্বদা খোঁজ নিতে আসতাম। কিন্তু কোনো রকম বৈঠক আর হতো না। তারপর প্রায় চার পাঁচ মাস কেটে গেছে — সেন মশায়ের মনও ভাল, শরীরও ভাল — তবে কাজকর্মের চাপ বোধহয় একটু বেশী হচ্ছিল। এই সময়ে একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতির অধিবেশনের পর তাঁকে একটু বেশী কর্মক্লান্ত দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেমন আছেন? একটু যেন ক্লান্ত ও চিন্তিত দেখাচ্ছে — সব ভাল তো?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, না" — একটু ইতস্ততঃ করলেন এবং পরক্ষণেই বললেন, "বুঝেছ, আজ সব শেষ হয়ে গেল, এ পাঁচ মাসে যা ঠিকঠাক্ হয়ে গেছে বলে মনে এক স্বস্তি এসেছিল, আজ বোধ হয় তা সব ভেঙ্গেচুরে শেষ হয়ে গেল। মিসেস্ সেন বোধহয় আর আমার এখানে থাকবেন না — জানি না, বাড়ী গিয়ে কি দেখবো — কিন্তু আমার যেন মনে হচ্ছে তাঁর পুরানো ব্যারাম এখনো যায়নি। আমার স্ত্রী কোনদিনই আমার মাকে ও বোনদের সহ্য করতে পারতেন না — তবুও সেই অসুস্থ অবস্থায় উপায়হীন হয়ে আমার ছোট বোন ছুটকীকে (প্রভা) অনুরোধ করে শুশ্রূষার ভার এবং আমার বাড়ীঘর চালাবার ভার দিয়েছিলাম যাতে আমার দৈনন্দিন জীবন ও আদালতের কাজ অব্যাহত থাকে। এতদিন তো ভালই চলছিল, কিন্তু এই কয়েক সপ্তাহ পূর্বে মিসেস্ সেন বলে বসলেন দিলীপের

কাছে নৈনীতে একটা ভাল বেয়ারাকে পাঠাতে হবে এবং চেয়ে বসলেন আমার খাস বেয়ারাকে (যে আমার আদালতের প্রস্তুতির জন্য সমস্ত সাজসরঞ্জাম করে দেয়) পাঠিয়ে দিতে। আমি অবাক হয়ে গেলাম — আপত্তি করলাম এবং বললাম তাতে আমি অচল হয়ে পড়বো — অন্য বেয়ারাকে পাঠিয়ে দেওয়া যাক্। কিছুতেই তিনি রাজী হচ্ছিলেন না, শেষে আমি জোর করে অন্য বেয়ারাটিকে পাঠিয়ে দিলাম। তারপর কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল — আজ বোধহয় তিনি বেশ ভাল বোধ করছিলেন, হুইলওয়ালা চেয়ার ঘুরিয়ে একেবারে সামনের ঘরে ঢুকলেন — সে ঘরে আমার মায়ের বড় একখানা সুন্দর তৈল-চিত্র উপরে ঝুলান ছিল — সেটি দেখে বলে উঠলেন 'she is still here to guard my house …?' — বলেই চেয়ার ঘুরিয়ে নিজের কামরায় চলে গেলেন। একটু পরেই তাঁর এক বর্ষীয়সী আত্মীয়া তীব্রস্বরে আমাকে বললেন, এ ফটোটা সরিয়ে ফেলা হোক — আমিও তীব্রস্বরে উত্তর দিলাম, "না, কিছুতেই তা হবে না — স্বর্গগত মায়ের ফটো সরিয়ে আমি তাঁকে অপমান করতে পারবো না।" আমিও আমার রাগ সংবরণ করতে পারিনি। এই নিয়ে দু'পাঁচ মিনিট কথাকাটাকাটি হলো — বুঝতে পারলাম মিসেসের জেদ চেপে গিয়েছে — মিসেস্ সেনকে ভীষণ উত্তেজিত দেখলাম এবং ব্যাপারটা আর বেশীদূর না গড়ায় এই কথা ভেবে তাড়াতাড়ি মিটিং-এ চলে এসেছি — জানি না বাড়ী গিয়ে কি দেখবো -- যা ঘটে গেল তা সহ্য করা যায় না — সহ্য করা উচিতও নয়। তুমি দুদিন পর একবার এসো।" এই সব কথা এক নিঃশ্বাসে বলে কিছু হাল্কা হয়ে চলে গেলেন। এসব শুনে আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। পরে জানলাম মিসেস্ সেন সেই আত্মীয়াকে নিয়ে তখনি তাঁর এক বন্ধুর বাড়ীতে উঠলেন — কয়েকদিন পর একটা ভিন্ন বাড়ী ভাড়া করে থাকতে লাগলেন। এর কিছু দিন পর মিসেস্

সেনের পিতার অসুস্থতার খবর পেয়ে তিনি কলকাতা চলে গেলেন — সেখান থেকে ৫।৬ মাস পর তিনি আবার লখনৌতে ফেরে এলেন এবং কেন্টন্মেণ্ট রোডে বাড়ী ভাড়া করে একটি নার্সকে নিয়ে থাকতেন। দিলীপ যখন নৈনী এগ্রিকাল্চারাল্ কলেজের শিক্ষা শেষ করে লখনৌ ফিরে এলেন, তখন মার কাছেই থাকতেন — প্রায়ই বাবার কাছে যেতেন — আমাদের সঙ্গে দেখা হতো। সম্প্রতি আমি লখনৌর অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের[১] সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তিনি অতুলপ্রসাদের স্ত্রীকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন এবং প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ করতেন। আমি তাঁকে বিশেষভাবে জানতাম না বলে অরুণপ্রকাশের সঙ্গে বসে অনেক আলোচনা করেছি। তাঁর কাছে শুনেছি যে, হেমকুসুম (অতুলপ্রসাদের স্ত্রী) খুব বিদূষী স্ত্রীলোক ছিলেন এবং তাঁর এমন কতকগুলি গুণ ছিল যাতে তিনি পরকেও খুব সহজে আপন করে নিতে পারতেন। অরুণপ্রকাশকে আমি একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলাম, যেমন ছোটছেলেদের মানুষ জিজ্ঞাসা করে — "আপনি দুজনের মধ্যে কাকে বেশী ভালবাসতেন।" তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, "অতুলপ্রসাদের সঙ্গে যখন সময় কাটাতুম তখন হেমকুসুমদিকে বেশী ভালবাসতুম, আবার যখন হেমকুসুমদির সঙ্গে সময় কাটাতুম তখন অতুলপ্রসাদকে বেশী ভালবাসতুম।" অর্থাৎ একজনের সঙ্গে বসে দ্বিতীয়জনের অভাব তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করতেন। আমি বললাম "তবে এ রকম হলো কি করে?" তিনি

১. প্রোফেসর অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র। ব্রহ্মবান্ধব "বন্দ্যোপাধ্যায়" উপাধি ছেড়ে, "উপাধ্যায়" উপাধি নিয়েছিলেন কেন, জিজ্ঞাসা করাতে জানতে পারলাম কেশবচন্দ্রের সঙ্গী ভাই গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়ের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেন বলেই। অরুণপ্রকাশ অতি সজ্জন, অতি শিক্ষিত, অতি অমায়িক, অতি ভদ্র এবং সমস্ত বিষয়েই তাঁর উদার দৃষ্টি।

বললেন "বিনয়বাবু, ওটা বিধির বিধান — দুজনই গুণী, দুজনই মানী — হয়তো অতি মাত্রায় মানী, আমি জানি দুজনেরই ব্যথা আছে — একজন তাড়াতাড়ি ভুলতে পারে — আর একজন ভুলতেই পারে না ···।" আমার ধারণা এই যে, সবের উপরে ছিল একটা দুর্জয় জেদ — জেদ বিদ্বেষকে আরও তীব্র করে। ক্ষমাশীল আর স্নেহশীল না হলে জীবনে কখনও শান্তি পাওয়া যায় না — আমি বিশ্বাস করি এটা মানুষের আয়ত্তাধীন — যদিও কঠিন।

অরুণপ্রকাশ হেমকুসুমের প্রশংসায় বললেন, একদিন দিদির সঙ্গে দেখা করতে গেছি — কথায় কথায় রাত হয়ে গেল — অবিশ্রাম বৃষ্টি হচ্ছিল — সেইখানেই রাত্রিযাপন করলাম — শুয়ে শুয়ে শুনছি হেমকুসুমদি গাইছেন "নিদ নাহি আঁখিপাতে···"। পরে আরো শুনেছি অতুলপ্রসাদের অন্য অনেক গান গাইতে — বুঝতে কোনো কষ্টই হতো না যে তাঁর প্রাণ আপনজনকে হারিয়ে নিদারুণ দুঃখে স্মৃতির পিছনে ছুটতো এবং একাকী থাকতে থাকতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠতো। যতদূর বুঝতে পারা যায় আর শোনা যায়, তাঁর প্রাণও কোমল ছিল — স্বামীর সঙ্গে মিলিত হবার ইচ্ছাও প্রবল ছিল, কিন্তু কী যেন দুর্জয় জেদ, অভিমান, অনাস্থা পথরোধ করে দাঁড়াত। আগেই দেখিয়েছি তাঁরা মিলিত হলেও একটা বিরাট দুঃখ ও দম্ভ আর একটা অজানা তিক্ততা নূতন অশান্তি সৃষ্টি করতো। আসল কথা এই যে, বিবাহিত জীবন সুখের হতে পারে যদি ছোট-বড় মতের বিরোধ, ছোট-বড় মান-অভিমান এমন কি ছোট-ছোট বিষয়ে বিশ্বাস-অবিশ্বাস এবং এইরকম আরো অনেক অন্তরায় নিঃসংকোচে দুজনই চেপে যেতে পারে, কিন্তু জীবনের আদর্শ, আপন ধর্ম যেখানে লাঞ্ছিত হয় সেখানে বোঝাপাড়ার কোনো স্থান নেই। আমি অতুলপ্রসাদকে এই মাপকাঠিতে যাচাই করি।

অতুলপ্রসাদের সঙ্গে কয়েকটা দিন

বোধহয় ১৯২৭ সনে আগস্ট মাসে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার সাত আট দিন পরই সেন মশায়ের সঙ্গে কর্মসমিতির অধিবেশন শেষ হবার পর একটু কথাবার্তা হলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আমার স্ত্রী আর ছেলেটি কেমন আছে ইত্যাদি। আমি বললাম, সবাই ভাল আছে, তবে আমার স্ত্রী একমাস পরে আসবে। তৎক্ষণাৎ তিনি বলে উঠলেন, "তবে কেন একা একা বাড়ীতে থাকবে ? আমার সঙ্গে দিন পনেরো কাটাও।" আমি তো থতমত খেয়ে গেলাম — আমার পক্ষে রাজী না হওয়া প্রায় অসম্ভব — দ্বিধা করাও চলে না — অথচ নিজের বাড়ীতে না থাকলে যেন কলেজে লেকচার দেওয়া অস্বাভাবিক মনে হয়। তাই বললাম "কি ব্যাপার ? সব ভালতো ?" তিনি বললেন, "মনটা ভাল নেই, শরীরটাও খুব ভাল নেই।" আমি হাল্কা সুরে হাসতে হাসতে বললাম, "হ্যাঁ, যেতে পারি যদি প্রতিদিন রাত্রিতে একটা মুরগ মুসল্লম্ পাই।" তিনি বললেন, "এ আর বড় কথা কি ? নিশ্চয়ই পাবে।" আমি এসে রইলাম — সকালে একত্র চা খেতাম — সে সময় দু'চারটে হাল্কা কথাবার্তা হতো — বিকালে যখন কাছারী থেকে ফিরতেন, আমিও তখন কলেজ থেকে ফিরতাম — সন্ধ্যায় তিনি চেম্বারে বসতেন, আমি নিজের আড্ডায় যেতাম — রাত্রিতে একা খেতে বসে অনেকরকম কথাবার্তা হতো — দোতলার ছাদে হাঁটতে হাঁটতে সদাসর্বদাই গানের টান দিতেন। দু-তিন দিন পর কাছারী থেকে ফিরে এসে বসলেন — বেয়ারা কোটপাতলুন খুলে নিয়ে গেল — তিনি বারান্দার ডেক্‌চেয়ারে বসে শরীর এলিয়ে দিতেই বেয়ারা হাত পা আঙ্গুলগুলি মাসাজ করে দিত, যাতে আদালতে

দাঁড়িয়ে থাকার কষ্টটার উপশম হয়। ওখানে বসেই চা খাওয়া শেষ করতাম। কিছুক্ষণ একথা-ওকথা হবার পর, ঘরের ভিতরে গেলেন এবং কয়েকখানা চিঠির মধ্য থেকে সত্ত-পাওয়া একখানা চিঠি আমার হাতে দিলেন পড়তে। চিঠিখানা মোটা চার-পাঁচ পাতা, ইংরাজীতে লেখা। আমি যতই পড়ি ততই অস্বস্তিবোধ করি — কয়েকটা কথা পড়ে একবার সেন মশায়ের দিকে তাকালাম। তিনি বললেন, "মাঝে মাঝে এরকম পেয়ে থাকি।" পড়া শেষ করতেই তিনি বললেন, "এই চিঠির মূল বক্তব্য বুঝলে তো? কি করবো বলো?" আমি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললাম, "একখানা নূতন মোটর চাইছেন — দিতেই হবে — উপায় কি?" তিনি উত্তেজিত হয়ে বললেন, "কখনই নয় — এই মোটরগাড়া নিয়ে তিনি বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়াবেন — বাঙালী, অবাঙালীর বাড়ী গিয়ে আমার কুৎসা করবেন — আমার মা ও বোনদের বিরুদ্ধে নানা কথা বলবেন, আর মহিলারা কপ্ কপ্ করে এ সব মিথ্যা কথা গিলে খাবেন।" চিঠি পড়ে দেখলাম অনেক আজে-বাজে কথা লিখেছেন — অনেক কাদা ছিটিয়েছেন এবং শেষে লিখেছেন যে আগামী দশবারো দিনের মধ্যে একখানা নূতন গাড়ী না এলে তিনি সেন মশায়কে হেয় করতে ছাড়বেন না — যেমন পূর্বেও একবার করেছিলেন ইত্যাদি ইত্যাদি। চুপ করে রইলাম — বুঝতে পারলাম সেন মশায়ের মনে কী বিরক্তি, কী তিক্তভাব। এও বুঝতে পারলাম এই মানসিক যন্ত্রণা লাঘব করবার জন্যই আমাকে কয়েকদিনের জন্য আনা। মনে আমার একটা শান্তি এলো যে, আমি সেন মশায়ের কাজে এলাম। আমি তাঁর চিন্তাকে অন্যদিকে ফেরাবার জন্য কয়েকটা হাল্কা কথা বললাম — "শুনেছি আপনারা দুজন বিলেত গিয়ে বিয়ে করেছিলেন এবং শুনেছি মিসেস্ সেন আপনাকে বিলেতে অনেক অর্থ সাহায্য করেছিলেন।" তিনি বললেন, "তুমি যা বলছ তা ঠিক্, কিন্তু সেটাতো আমাদের সকলের জন্যই খরচ হয়েছে — একসঙ্গে থাকতে

হলে ছুজনকেই খরচ করতে হয়।" আবার তখনই বললেন, "আমার বিলেতের লেখাপড়ার খরচ তো আমার মামা প্যারীমোহন গুপ্ত (সাহানার পিতা) ও পানী মামা দিয়েছেন। এমনও অসুবিধায় কখনো কখনো পড়েছি যখন আমার বোনরাও অনেক সাহায্য করেছে — হিরণ, কিরণ প্রয়োজনে খুব সাহায্য করেছে এবং টাকা ফেরৎও নিতে চায় না।" তিনি বলতে লাগলেন, "তাদের জীবনে সব হারিয়ে তারা আমাকেই কেবল অবলম্বন করে আছে — মাঝে মাঝে এখানে আমার সঙ্গে থাকতে চায় — আমার প্রথম ছু'বোনের প্রচুর অর্থ আছে — একজনের স্বামী মাদ্রাজের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার ছিলেন — বেশ টাকা রেখে গেছেন; দ্বিতীয় বোন আনন্দমোহন বসুর পুত্রবধূ — তাঁরও টাকার অভাব নেই — টাকার অভাব কেবল আমার তৃতীয় বোনটির। আজ সকলের সাহায্যে আমি সমাজে ও ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত — এখন আমার কর্তব্য এদের সকলকে দেখাশুনা করা।"

অতুলপ্রসাদ ও তাঁর মা

অতুলপ্রসাদ আমাকে বলতে লাগলেন —

"আমার মা মৃত্যুর কিছুদিন আগে বলেছিলেন, আমি তো তোর স্ত্রীকে তোর কাছে ফিরে আসার জন্য অনেক সুযোগ দিয়েছিলাম — ছু'বার তিন বৎসরের জন্য আমি তোর কাছে আসিনি, কিন্তু লক্ষ্য করে দেখলাম যে হেম ছু'তিন বার তোর কাছে গিয়েও ঝগড়া করে বাড়ী থেকে তোকে ছেড়ে চলে গেছে, তখন বুঝলাম হেমের মেজাজ ঠিক্ হবার নয়। এ সব দেখে অনেক চিন্তা করে এবার আমি তোর কাছে এসেছি — বোধহয় এই শেষ — যাবার আগে ওদের তোর হাতে দিয়ে গেলাম। তোর ছুটি বোন হিরণ কিরণ অত্যন্ত ছুঃখী — হেম

রেগে গিয়ে যা যা বলেছিল তা হিরণ কিরণের জীবনে সবই ফলেছে — হিরণ কিরণ ছেলেমেয়ে হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছে—তোর হাতে তাদের দিয়ে গেলাম — তুই দেখিস।" এই কথাগুলি তিনি উত্তেজিত হয়ে গড়গড় করে বলে গেলেন এবং ছোট ছাদে পায়চারি করতে লাগলেন। আবার বললেন, "আমি আমার স্নেহময়ী মাকে দেখবো না, আনবো না — ভুলে যাব, আর……।" দুজনই কিছুক্ষণের জন্য চুপ —আমিতো কেবল শুনেই যাচ্ছি। চুপ করে ভাবছি আর অনুভব করছি — সেন মশায়ের মার প্রতি কী অগাধ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা! এ শ্রদ্ধা সম্বন্ধে অরুণপ্রকাশের কাছ থেকে একটি কথা শুনেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, অতুলপ্রসাদের মার মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে যখন মা অজ্ঞান অবস্থায় পড়েছিলেন তখন তাকে (অরুণপ্রকাশ) ঘরে ডেকে অতুলপ্রসাদ বললেন, "মা এখন সংজ্ঞাহীন — আমার "কয়েকটি গান" মুদ্রিত হয়ে এইমাত্র এলো — তোমাকে সামনে রেখে আমি আমার বইখানা মার পাদপদ্মে নিবেদন করতে চাই" —এই বলে অতুলপ্রসাদ মার পায়ের উপরে পড়ে শিশুর মতো কাঁদতে লাগলেন — এ করুণ দৃশ্যে অরুণপ্রকাশকেও বাইরে এসে চোখ মুছতে হয়েছিল।

মা যে আরাধ্য দেবতা সেটা সেন মশায়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ বসলেই বুঝতে পারা যেত। একদিকে বিচার-অনপেক্ষ ভালবাসা দেখে মনটা যেমন উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হতো, তেমনি অন্য দিকে ভাবতাম কোন্ অসাধারণ ক্ষমতার জোরে মার অপরাধ অগ্রাহ্য করে, মাকে দেবতার স্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন — যখন সেন মশায় করতে পেরেছেন তখন তিনি আমার অনেক উর্ধ্বে এবং প্রণম্য। এই ভাবতে ভাবতে আমি অনেক সময়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকতাম। সেদিনও চেয়েছিলাম এবং মনের মধ্যে সে চিন্তাগুলি আঘাত করছিল। কিন্তু সে সব কথা প্রকাশ করবার মতো নির্দয় হবার অধিকার আমার নেই। তাই ভাবতে ভাবতে অন্যমনা হয়েছি — হঠাৎ, তিনি বললেন,

"এবার আমাকে আপিস ঘরে ঢুকতে হলো — তুমি ততক্ষণ ঘুরে এসো।"

আজ পঁয়তাল্লিশ বৎসর পর আমি যখন স্মৃতিচারণ করছি এবং সেই কথোপকথনের চিত্রটি আমার মনের সামনে ধরছি, তখন অতুল-প্রসাদ নেই, হেমকুসুম নেই, হেমন্তশশী নেই, বোনেরা সব গত, তখন নির্দয় ও নিরপেক্ষ অদৃষ্টলিখন প্রায় সবটাই ইতিহাসের সঙ্গে মিশে গেছে — আছে কেবল শেষরেশটুকুর ক্ষীণচিহ্ন — তাই আমি আজ স্মৃতিপথে আনছি সেই সন্ধ্যাবেলাটিকে আর আমার পুরোনো দিনের মনের ভাব, —

সেন মশায় হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে খোলা বারান্দায় পায়চারী করছেন, আর আমি তাঁর দিকে চেয়ে আছি আর ভাবছি — এই মানুষটি কি? কত ঘাতপ্রতিঘাতে জীবন বিধ্বস্ত — কত অপমান হৃদয়ে পুঞ্জীভূত — কত স্বপ্ন দেখা আনন্দের, শান্তির আর আকাঙ্ক্ষার জন্য মনপ্রাণ লালায়িত, মিশে গেল সব নৈরাশ্যে আর ব্যর্থতায়। মানুষের জীবনের গাঢ়তম অন্ধকারে ও দুঃখে, যার ক্রোড়ে মানুষ আশা করে আশ্রয় চুম্বন, সেখানে যদি দেখা যায় পঙ্কিলতার ইঙ্গিত — একদিকে আত্মতৃপ্তির প্রয়াস স্নেহকে গ্রাস করেছে, শ্লথতা শুচিতাকে অহেতুক অগ্রাহ্য করেছে, অন্যদিকে, নিবিড় নৈরাশ্য, তীব্রজ্বালা আর ক্ষমাহীন প্রাণের নিষ্ফল আক্রোশ দেহমনকে বিবর্ণ করেছে, তখন কি মনে হয় না যে, এই গীতিকার অতুলপ্রসাদ কী মায়ার ইন্দ্রজাল থেকে গাইতে পারলেন —

আমার মনের ভগনদুয়ারে,
সহসা তুমি কে গো, তুমি কে ?
নন্দন-আভা-বেষ্টিত তনু,
উজল নিজ আলোকে
তুমি কে গো, তুমি কে ?

এ কি প্রেমপ্রতিম অঙ্গ,
এ কি যৌবনরূপ রঙ্গ,
এ কি মন্দাকিনী মন্দ-সলিল ভঙ্গ,
এ কি সহসা মম জীবন-বন পুষ্পিত,
তোমার নয়ন-পলকে
তুমি কে গো, তুমি কে ?....

অতুলপ্রসাদ এবং তাঁর স্ত্রী ও পুত্র

আমার স্মৃতিচারণ এখনো চলেছে এবং সেই কথোপকথনের চিত্রটিও সম্মুখে আছে। আমি ভাবছি — কই, কবি তো ব্যথায়, ঘৃণায়, অপমানে জর্জরিত হয়েও তাঁর কবিতার ভিতর দিয়ে স্ত্রীজাতির প্রতি কোনো বিষ উদ্‌গীরণ করলেন না! শান্তভাবে ব্যথা আর অপমান অগ্রাহ্য করে নিজ কর্তব্য পথে চলতে লাগলেন। তখন কি কোনো সন্দেহ থাকে যে অতুলপ্রসাদ একটি বিস্ময়কর চরিত্র ? ব্যথা অনেক বড় বড় কবিও পেয়েছেন—অতুলপ্রসাদও পেয়েছেন, কিন্তু ব্যথার কাছে কবিরা পরাজয় স্বীকার করেন না — অতুলপ্রসাদ ব্যথাকে রূপায়িত করে উচ্চ স্তরে নিয়ে গেছেন। এই প্রসঙ্গে একটি শোনা কথা বলি, আমি তাঁর বড় ভাই সত্যপ্রসাদ সেনের কাছে শুনেছি। একদিন অতুলপ্রসাদ বাড়ীর ভিতরে ঢুকে দেখতে পেলেন, তাঁর সমুদয় কোট, পাতলুন স্তূপীকৃত হয়ে আগুনে জ্বলছে। তিনি ক্রোধ এবং বহ্নি থেকে পালিয়ে এসে দাদার বাড়ীতে রাত কাটালেন। সত্যবাবু আমাকে বলেছেন যে সেইদিন অতুলপ্রসাদ এই গানটা লিখেছেন —

যাব না, যাব না, যাব না ঘরে
বাহির করেছে পাগল মোরে।.......

এ থেকে দেখা যায় কী জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে তিনি লিখেছিলেন — "যাব না, যাব না, যাব না ঘরে।" কিন্তু কবির কলম ক্ষুদ্র ব্যথাকে উঁচু স্তরে নিয়ে গিয়ে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করিয়ে দিলো, "বাহির করেছে পাগল মোরে…।" এই জন্যই অতুলপ্রসাদ কবি এবং একটি মধুরতম চরিত্র — সাধারণ মানুষের স্তর থেকে উচ্চে — এইখানেই অতুলপ্রসাদের মহত্ব, সংযম। তিনি ব্যবহারে ও চিন্তায় মিষ্টতা ও শুচিতা রক্ষা করা ধর্মের অঙ্গ মনে করতেন। অনেক উদারতা ও মৈত্রীর তাগিদে গেয়েছিলেন —

মনের দুঃখ চাপি মনে,
হেসে নে সবার সনে …

তিনি সত্যিই এই নির্দেশ তাঁর জীবনে মেনে নিয়েছিলেন — কখনও মনের দুঃখ, অশান্তি ও অপমান লঘুচিত্তে প্রকাশ করেননি — দুঃখ ও অপমান গৌরবের সঙ্গে বহন করে নিয়েছেন।

অতুলপ্রসাদের বাড়ীতে থাকাকালীন তৃতীয় অথবা চতুর্থ দিনে যে-কথোপকথন হয়েছিল তা বলতে গিয়ে আমি আমার কতকগুলি লুকানো ভাবও প্রকাশ করে ফেলেছি। এখন আবার সেই সময়েই ফিরে এলাম তাঁর বাড়ীর দোতলার বারান্দায়। সেদিন অন্ততঃ আধ-ঘণ্টা একটা থমথমে ভাবের মধ্যে দুজন কাটিয়েছিলাম। তিন চার দিন পর আবার মিসেস্ সেনের একখানা চিঠি এলো — আবার তিনি আমাকে পড়তে দিলেন। আমি পড়লাম কিন্তু একটি কথাও বললাম না। কিছুক্ষণ পর সেন মশায় বললেন, "তুমি তিন চার দিনের মধ্যেই তোমার পছন্দমতো একখানা নূতন গাড়ী কিনে মিসেস্ সেনকে পাঠিয়ে দিয়ো, আর কোম্পানীকে বলো বিলটা যেন আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়।" আমি রাজী হয়ে গেলাম। পরদিন এই অছিলায় অনুমতি চাইলাম নিজের বাড়ী ফিরে যেতে। দু'তিন দিনের মধ্যে একখনা "প্লাইমাউথ" গাড়ী পাঠিয়ে দিলাম। সাত-আট দিন পর

একখানা চিঠি পেলাম মিসেস্ সেনের কাছ থেকে — তিনি লিখেছেন আমাকে তাঁর সঙ্গে অবশ্য দেখা করতে। পড়লাম আর এক বিপদে।

তাঁর মনের মধ্যে এমন একটা ভ্রান্ত ধারণা জন্মেছিল যে আমিই সেন মশায়কে অনেক বিষয়ে পরামর্শ দিই, তা না হলে তিনি আমাকে ডাকবেন কেন? আমার ভয় হলো, হয়তো আমার সঙ্গে কথাবার্তার আশ্রয় নিয়ে তাঁদের মধ্যে নূতন রকমের মনান্তর না হয়। আমি গেলাম না। আবার পাঁচ-সাতদিন পর, আর একখানা চিঠি এলো আমাকে যেতে অনুরোধ করে। আমার অশান্তি বেড়ে গেল — আমি গেলাম না — চিঠির উত্তরও দিতে সাহস করলাম না। তার কয়েকদিন পর তাঁর এক আত্মীয় পূর্ণেন্দু সেন (এল, আই, সি) আমার কাছে এলেন এবং মিসেস্ সেনের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন। আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললাম যে, সেন মশায় হয়তো ভাববেন আমার যখন কারুর উপরে জোর নেই তবে আমি কেন গেলাম? হয়তো সেন মশায় আমাকে ভুল বুঝবেন আর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলবেন। পূর্ণেন্দু বললেন, "সেন মশায়ের স্ত্রী নিতান্ত অসুস্থ, তাঁর কথা রাখা কি অসম্ভব?" আমি বুঝলাম, খুব অসুবিধায় পড়লাম — বললাম, একটা উপায় বের করতে হবে। অনেক চিন্তা করে একটা ভাল উপায় বের করলাম — আমি একদিন বেলা সাড়ে চারটার সময় বাড়ী থেকে রওনা হলাম — পৌনে পাঁচটায় মিসেস্ সেনের বাসায় পৌঁছুলাম — আধঘণ্টা তাঁর বক্তব্য শুনলাম — একপেয়ালা চা খেয়েই সোজা সেন মশায়ের বাড়ীতে গেলাম। সেন মশায় দেখেই বললেন, "আজ যে এত সকালে? কিছু বিশেষ কথা আছে না কি?" আমি বললাম, "এক মন্দির থেকে আর এক মন্দিরে এলাম — মিসেস্ সেনের কাছ থেকে কেবল চিঠিই আসছিল, আমাকে তাঁর কাছে যাবার জন্যে — আমি না যাওয়াতে নানকু সেনকে পাঠিয়ে

ছিলেন — তিন-চার দিন ভেবেচিন্তে আজ এইমাত্র ভদ্রতা রেখে এলাম — আর সোজা আপনার কাছে এলাম — সাধারণ ভদ্রতা রাখা উচিত মনে করলাম।" বুঝলাম তিনি খুসী হয়েছেন, তাই হেসে রসিকতা করে বললেন, "তোমাকে জয় করে ফেললেন না কি? মিসেস্ সেন কিন্তু অন্যের বেলা খুব মিষ্ট হতে পারেন — তাছাড়া তোমরা যা চাও, সুন্দর ইংরাজী বলেন — ভাল বেহালা বাজিয়ে মন খুসী করে দিতে পারেন, কেবল আমার উপরেই আক্রোশ আর আমার সব কাজেরই নিন্দা। এগুলিতো তুচ্ছ কথা — আমার মাসী বোন দাদা এবং অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আমার এত হৃদ্যতা তিনি মোটেই পছন্দ করেন না — আমি আবার চাই সকলে আসুক, একসঙ্গে আনন্দ করা যাক — ভুল ভ্রান্তি ভুলে যাই — তুমিও এসে থাক — পুরোণো জিনিস পিছনে পড়ে থাক।" একটু থামতেই আমি অন্য প্রসঙ্গ তুললাম — বললাম, "মিসেস্ সেন চান এখন দিলীপের বিয়ের জন্য আপনি একটু চেষ্টা করুন, আর চান যে দিলীপকে হাজার দশেক টাকার মূলধন দিয়ে কোনো ব্যবসাতে যুক্ত করে দেওয়া।" সেন মশায় যে এত উত্তেজিত হয়ে উঠবেন তা মোটেই ভাবিনি — বললেন, "আমিও এইরকম চিঠি পেয়েছি — বিয়ে আমি দেবো না স্থির করেছি — বিয়ে করে সেও যে দুঃখ পাবে না, তা কে বলতে পারে?" তারপর বললেন, "তুমি জান না, এ বিষয়ে আমি কি স্থির করেছি — আমি আমার উইলে দিলীপের জন্য মাসিক পঞ্চাশ টাকা বরাদ্দ করে রেখেছি।" এর প্রত্যুত্তর আমি তখনি দিয়েছিলাম — প্রথম বলেছিলাম, দিলীপের জন্য খুব কম পক্ষে, একশো টাকা করে দিতেই হবে (তখন জিনিসপত্র খুব সস্তা ছিল, আর কে জানত টাকার দাম এরকম হবে?) এবং দ্বিতীয়, দিলীপ আপনার আশানুরূপ হয়নি সত্য, কিন্তু মানুষ হিসাবে সে মোটেই নিন্দের নয় — সে ভদ্র, সে সৎ, সে পরোপকারী, সে সত্যবাদী, সে চরিত্রবান্, অনেক রকমে সে অনেকের সমান। একমিনিট

চুপ থেকে বললেন, "তোমার মুখে একথা শুনে খুব ভাল লাগলো — আমি চেয়েছিলাম ওকে দূরে সরিয়ে দিতে, নিজের পায়ে দাঁড় করাতে, মানুষ হয়ে যেতো, তা হলো না, পারলাম না — সত্যিকারের দুঃখতো আমার এইখানে।" আমি মর্মে মর্মে বিশ্বাস করি এই তাঁর বড় দুঃখ।

বাড়ী ফেরবার পথে, মনের মধ্যে এই ভাবনাই চলতে লাগলো দিলীপ কেন প্রাচুর্যের সুবিধা পেয়েও আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে পারল না। আমি জানি ও বুঝি মায়ের এত নেওটা হলে ছেলে কখনো বড় হতে পারে না — আবার এটাও জানি যে, যে-পিতামাতা পুত্রের ভবিষ্যতের দিকে সর্বাপেক্ষা বড় দৃষ্টি না রেখে আত্মাভিমানে অন্ধ হয়ে নিজেদের বিরোধকে যথেচ্ছ পরিপোষণ করেন, তাঁদের দুঃখ করা সাজে না, পুত্রের অসফলতায়। তাছাড়া আমার কখনও কখনও মনে হয়েছে সেন মশায় একমাত্র পুত্রের প্রতি যথেষ্ট মিষ্ট ব্যবহার সর্বদা দেখাতে পারেননি — অনেক সময়েই অসহিষ্ণু হয়েছেন। সেন মশায় কিছুটা জেদী ছিলেন — জেদকে যখন সংযত রাখতে চেষ্টা করতেন তখন বাক্যস্ফূর্তি ঠিক-মতো হতো না — মনে হতো তোত্‌লাচ্ছেন। এই ভাবে অনেক সময়ে কথাবার্তা হওয়াতে অন্যান্য আত্মীয়েরা ও বন্ধুবান্ধবেরাও মাঝে মাঝে অসহিষ্ণু হয়েছেন — আমি দেখেছি দিলীপ স্নেহ ও সহানুভূতি থেকে অনেক সময়ে বঞ্চিত হয়েছে। অন্যদিকে সেন মশায় ছেলের জন্য যথেষ্ট করেছেন এবং ভেবেছেন — অল্প বয়সে দিলীপকে তার হেমন্তকাকার সঙ্গে বিলাতে পাঠিয়েছেন, যাতে জীবনে সে কিছু করে আসতে পারে। তা যে হলো না — দিলীপের অদৃষ্ট — চেষ্টার ত্রুটি হয়নি। একদিন সেন মশায় রেগে কিছু বলেছিলেন — দিলীপ একান্তে আমাকে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন "Such parents cannot expect a better son"। বুদ্ধিমানের কথা সন্দেহ নেই। অনেক প্রকার গুণ থাকা সত্ত্বেও দিলীপ আত্মবিশ্বাস ও মনোনিবেশের অভাবে নিজের পছন্দমতো জীবন গড়তে পারল না। তবুও পরিবার নিয়ে সে সুখী।

অতুলপ্রসাদের উইলের কথা আমি খুব কমই জানি, কিন্তু আসলটুকু জেনেছি যে, তিনি দেশের জন্য সর্বস্ব একটা ট্রাস্ট করে মিঃ ঘোষ ও মিঃ দাসকে একজেকিউটার করেছিলেন, আর তাঁরা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হাতে দিয়ে দিয়েছেন, আর নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁর জীবিতকালে যারা নিয়মিত সাহায্য পেতো মৃত্যুর পরও ঠিক সেই ভাবেই তারা পেতে থাকবে। দিলীপের অংশ খুবই কম, কিন্তু উত্তরাধিকারী হিসাবে আমি তাকে প্রশংসা করি যে সে পিতার আদর্শকে মর্যাদা দিয়েছে — ব্রাহ্মসমাজও উদারতা দেখিয়েছে দিলীপের স্বার্থকে অনেকটা মেনে নিয়ে। এই উইলের মূলনীতি ভাবলে বলতে হয়, এই উইল মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত — সর্বসাধারণের অনুকরণীয়। দেশের আর ক'জন লোক এ ভাবে ভেবেছে! অতুলপ্রসাদ গরীব সংস্থার জন্য কিছু কিছু দিয়ে গেছেন। দান ক্ষুদ্র কিন্তু অতুলপ্রসাদ মহানুভব — সন্দেহ নেই।

অতুলপ্রসাদ ও উনিশ শতকের বাংলার চিত্র

বাল্যকাল থেকেই অতুলপ্রসাদের জীবন সহজভাবে গড়ে উঠতে পারেনি, তার প্রধান কারণ এই যে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়েছিল যখন তাঁর বয়স বারো-তেরো বৎসর। এতে তাঁর লেখাপড়ায় বাধা পড়েছিল অনেক রকমে। তাঁকে মাতামহের (সাধু কালীনারায়ণ গুপ্তের) কাছে ঢাকার বাইরে গিয়ে থাকতে হলো। বাড়ীতে আর্থিক অবস্থা খারাপ ছিল, কিন্তু মাতুলালয় (স্যর কে. জি. গুপ্ত, প্যারী গুপ্ত, পানী গুপ্ত, বিনয় গুপ্ত) বাংলা সমাজের একটি বর্দ্ধিষ্ণু পরিবার — শিক্ষায়, অর্থে, পদগৌরবে, সমাজসেবায়। অতুলপ্রসাদের পিতা রামপ্রসাদ সেন ঢাকায় চিকিৎসক ছিলেন এবং একজন ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন, সদাশয় লোক

বলে খ্যাতি ছিল। যতটা জানা যায়, তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দ্বারা দীক্ষিত হয়েছিলেন। মহর্ষির স্নেহ পেয়েছিলেন বলেই তিনি কলকাতা মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হয়ে ডাক্তার হতে পেরেছিলেন। তারপর, কেশবচন্দ্র যখন ঢাকায় গিয়ে তাঁর নূতন আদর্শের (পরে নববিধান বলে খ্যাত) মূল সূত্রগুলি জনসাধারণের ভিতর প্রচার করলেন ও বিশ্লেষণ করলেন, তখন ঢাকার ও বরিশালের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি কেশবের ঐ আদর্শ, তথা নববিধান, গ্রহণ করলেন। রামপ্রসাদ সেনও নববিধানে যোগ দিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের ধর্মসাধনায়, সমাজ সংস্কারে, জাতিনির্বিশেষে সমান অধিকার দানে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী আনয়নে, স্ত্রীজাতির মধ্যে সুশিক্ষাবিস্তারে, জনসাধারণের অন্যান্য সেবাকার্যে দেশবাসীরা এমন ভাবে প্রভাবিত হলো যে অনেক খ্যাতনামা পুরুষ সেই প্রাণময় আদর্শে যোগ দিলেন। কিন্তু কেশবচন্দ্রের দৃষ্টি ছিল প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ধর্মজীবন ও ভক্তি-জীবনের প্রতি। তাঁর আদর্শে সভ্যরা কেবল নীতিবাদে ও একেশ্বরবাদে দীক্ষিত হলেই নববিধানসমাজের অন্তর্ভুক্ত হবার যোগ্যতা অর্জন করেন না, সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ ধর্মজীবনও বিশেষ আবশ্যক। এ যোগ্যতা খুব কম লোকেরই ছিল এবং ক্রমে ক্রমে দেখা গেল অনেকেই নববিধান ছেড়ে দিতে লাগলেন। কেউ কেউ ব্রহ্মানন্দের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের এই নূতন আদর্শ রাখতে পারলেন না। যাঁরা পারলেন না অথবা যাঁরা চাইলেন না, তাঁরা একেশ্বরবাদী ও যুক্তিবাদী হয়েই পৃথক রইলেন, কারণ ভক্তিবাদকে তাঁরা কুসংস্কার মনে করতেন। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি-ভাব ও বিশ্বাস তাঁদের খুবই ছিল, কিন্তু এতদ্ব্যতীত ভক্তিপ্রকাশ তাঁরা চরিত্রের দুর্বলতা মনে করতেন, এমন কি, তাঁরা কুসংস্কার বলে বিবেচনা করতেন। যুক্তিবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা এত প্রবলভাবে এই গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করেছিল যে শেষে তাঁরা "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ"-

বাদী বলে নিজেদের নূতন সংগঠন করলেন। কয়েক বৎসর এইভাবে কাটিয়ে, ১৮৭৮ সনে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করলেন — এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন বিশেষ করে দুর্গামোহন দাশ, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, এবং পরে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

হিন্দুদের পৌত্তলিকতা, হিন্দুয়ানীর গোঁড়ামি এবং হিন্দু অনুষ্ঠানের অনাবশ্যক বাহুল্য থেকে হিন্দুসমাজকে উদ্ধার করবার অমানুষিক চেষ্টা করেছিলেন রাজা রামমোহন রায় — তাঁর আর মহর্ষির উপাসনা (বেদপাঠ) জাতিভেদকে অমান্য করে নয়, কিন্তু কেশবচন্দ্রের উপাসনা সকলকে একত্র করে, জাতিনির্বিশেষে, সাম্প্রদায়িকতাকে অগ্রাহ্য করে। এই সামাজিক মুক্তির জয়গান সকলের মনের ভিতরে সাড়া জাগিয়েছিল। তাই দেখতে পাই, সে সময়টায় উচ্চশিক্ষিত সমাজের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের স্বাধীন চিন্তা, অবাধ মেলামেশা, স্বস্ব সিদ্ধান্তের (প্রাচীন সমাজিক রীতিনীতিকে বাদ দিয়ে) উপর আত্মজীবন নিয়ন্ত্রিত করা। যাঁরা সমাজের উচ্চ স্তরে, তাঁরা দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিলেন পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্যিক আড়ম্বরগুলিও অনুকরণ করে। সমাজের নেতাদের মধ্যে এমনও দেখা গেছে যে স্ত্রীকে বিদেশীপোষাকে সাজিয়ে, এমন কি টুপি-বুট পরিয়ে উপাসনায় নিয়ে এসেছেন। কোথায় পড়ে রইল পাশ্চাত্য সভ্যতার মূলমন্ত্র, আর কোথায় এসে পড়লো অর্থহীন বাহ্যিক সমাজ-রীতির অনুকরণ! এ কথা ঠিক যে, একবার সমাজের বাধানিষেধ থেকে মুক্তি পেলে কিছু আতিশয্য স্বাভাবিক — তাছাড়া অসবর্ণ-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ, অতিনিকট আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিবাহ (পূর্বে যে সব বিবাহে সামাজিক বাধা ছিল) ইত্যাদির চলন বাড়তে লাগলো। সেই সময় যাঁরা প্রথমদিকের আই. সি. এস যেমন, কে. জি. গুপ্ত, বি. এল. গুপ্ত, রমেশ দত্ত, সুরেন ব্যানার্জি — তাঁদের সতীর্থ সিনিয়র র‍্যাঙ্গলার ব্যারিস্টার আনন্দমোহন বসু, আইন-

ব্যবসায়ে অগ্রণী কালীমোহন দাশ, দুর্গামোহন দাশ এবং ভুবনমোহন দাশ ইত্যাদিরা বাধানিষেধ অগ্রাহ্য করে নিজেদের যুক্তিসিদ্ধ পথে এগিয়ে গেলেন। বাঙালী সমাজের অন্যান্য সংস্কারের কথা বাদ দিয়ে যেটা সবচেয়ে বড় (বিবাহ), সেই বিবাহ অনেকক্ষেত্রে অসবর্ণ হয়ে, সমাজের কঠোর বিধি-বিধানকে অনেকটা শিথিল করলো — এই প্রকার বিবাহ বাড়তে লাগলো। আমরা দেখতে পাই কে. জি. গুপ্তের ভগিনীর বিবাহ হলো প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের সঙ্গে, সি. আর. দাশের ভগিনীর বিবাহ হলো ব্রাহ্মণ পরিবারে, সি. আর. দাশ নিজে বিবাহ করলেন ব্রাহ্মণ পরিবারে, কন্যাকে বিবাহ দিলেন কায়স্থ পরিবারে, ছোট ভাইকে বিবাহ দিলেন ব্রজেন্দ্র শীলের মেয়ের সঙ্গে, ভাগিনেয়ী সাহানাকে বিবাহ দিলেন কায়স্থ পরিবারে, দুর্গামোহন দাশের কন্যার বিবাহ হলো স্যর জে. সি. বোসের সঙ্গে, অতুলপ্রসাদের দুইবোনের বিবাহ হলো দুটি মাদ্রাজী ভদ্রলোকের সঙ্গে, এক বোনের বিবাহ হলো আনন্দমোহন বসুর পুত্রের সঙ্গে। আমরা আরও দেখি প্রসন্ন সেন (জাস্টিস্ প্রশান্ত সেনের পিতা) বিবাহ করলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ভাগিনেয়ীকে, রমেশ দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ হলো ব্রহ্মানন্দ কেশবের ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে, জাস্টিস্ প্রশান্ত সেন বিবাহ করলেন সুষমা বসুকে (বিখ্যাত পি. এন. বসুর কন্যা)। এই ধরণের অসবর্ণ বিবাহাদি সমাজের অগ্রগতির পক্ষে হিতকারী এবং সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের অনুপন্থী। কিন্তু যখন সমাজহিতের গণ্ডী ছাড়িয়ে যায়, তখন ব্রাহ্ম-সমাজের — তথা, দেশের সমাজ সংস্কারকদের আদর্শ নিষ্ঠুরভাবে ক্ষুণ্ণ হয়। যেখানে সমাজ বাল-বিধবার বিবাহ হিতকর বিবেচনা করে বিধবাবিবাহের প্রচলন যুক্তিসিদ্ধ স্থির করলো ও আইনেতে পরিণত হলো, সেখানে প্রৌঢ়-বিধবা-বিবাহ অসঙ্গত ও অবাঞ্ছিত। তবুও সমাজে আইনের সুবিধা নিয়ে কিছু কিছু এ রকম বিবাহ হয় — যেমন, ব্রাহ্মসমাজের নেতা দুর্গামোহন দাশ ডাক্তার রামপ্রসাদ

সেনের প্রৌঢ়া-বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করলেন। সমাজের প্রাণহীন কঠোরতা থেকে মুক্তি পেলে একটু যে অশোভন কাজও আইনের ফাঁক দিয়ে হতে পারে তার দৃষ্টান্ত শুনেছি — তখনকার ব্রাহ্মসমাজের এক নেতার বিধবা বিমাতার পুনর্বিবাহে পুত্রেরা তো আপত্তি করলেনই না, বরং সাহায্যই করেছিলেন। লোকেদের মুখে এই ব্যাপারের বিবরণটা কটু শোনায়, কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তেমন অন্যায় নাও হতে পারে যদি বিমাতার বয়স খুব কম হয়। বাল-বিধবার পক্ষে সমস্ত জীবন একলা থেকে উন্নততর জীবন যাপন অতি দুঃসাধ্য — সমাজের অযৌক্তিক বিধিনিষেধ যত কমতে লাগল, চিন্তাশীল লোকের চিন্তা ততই স্বতঃস্ফূর্তি লাভ করলো। ব্রাহ্মসমাজ সমাজসংস্কার বিষয়ে অগ্রণী ছিল, কিন্তু হিন্দুদের মধ্যেও এ ভাব কম প্রবল হয়নি। কয়েকজন মনীষী দীক্ষা নিলেন না, কিন্তু বিশেষভাবে প্রভাবিত হলেন যেমন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাঁর চিন্তা অসাধারণ প্রগতিশীল ছিল — শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি কী না করেছেন — নৈতিকজীবনের উন্নতির জন্য কী না করেছেন — তিনি সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ থেকেও হিন্দুয়ানীর গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেননি — যুক্তিবাদী হয়ে চিন্তাকে এমন স্বাধীন ভাবে চালিত করেছিলেন যে হিন্দুদের বেদ উপনিষদ্ সাংখ্য ইত্যাদির উপর তাঁর নিজের শ্রদ্ধা থাকলেও সেই সময়ে সংস্কৃত ভাষার ও দর্শনের উপর জোর দিতেন না, যেমনটা দিতেন বিজ্ঞান শিক্ষার উপরে।

রাজা রামমোহন যে-ভাবে হিন্দুসমাজের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে অভিযান করেছিলেন ও যে-চেষ্টায় অশাস্ত্রীয় সতীদাহ প্রথা অপসারিত করে ভারতের একটা কলঙ্ক দূর করেছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র সেই উদ্দীপনায় বাল-বিধবা-বিবাহের প্রচলনের জন্য জীবনপণ করবেন এটা খুব স্বাভাবিক। সমাজের এ দুটি মহৎ কার্য যত বড়ই হোক না কেন, তাদের মূল উৎস মানুষের স্বাধীন চিন্তা ও যুক্তিসঙ্গত মত আরও মহৎ। রামমোহন আর ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের তফাৎ, কিন্তু

এর মাঝামাঝিতে (১৮০৯ সনে) জন্মেছিলেন এক মহামনীষী যাঁর নাম ডিরোজিয়ো — বাংলায় ক্রীশ্চান পরিবারে (ডাচ্ বা পর্তুগীজ)। তিনি ষোল সতেরো বৎসর বয়সে বাংলার সমাজে আবির্ভূত হলেন একটা উল্কার মতো এবং স্কুলে শেখাতে লাগলেন মানবিকতা, স্বাধীন চিন্তা, আত্ম-প্রত্যয় ও যুক্তিবাদ। ডেভিড্ হেয়ার ক্ষেত্র প্রস্তুত করছিলেন — পরে বেথুন ও ডাফ্। অনেক ছাত্র[১] অনুপ্রাণিত হলো — তাদের নাম চিরকাল বেঁচে থাকবে। তিনি বাইশ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করলেন, কিন্তু বাংলার নবজাগরণে তাঁর নাম চিরস্মরণীয়। এঁরাই মুক্তির বাণী ঘোষণা করেন তাঁদের কর্ম দিয়ে, চিন্তা দিয়ে, লেখনী দিয়ে, সংগঠন দিয়ে, নির্ভীকতা দিয়ে।

ঈশ্বরচন্দ্রের ব্যক্তিত্ব ও তেজস্বিতা সর্বজনবিদিত — তাঁর বিশ বৎসর পর এলেন আর দুটি প্রতিভাসম্পন্ন চিন্তাশীল ব্যক্তি — কেশবচন্দ্র সেন এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম নিলেন না কিন্তু কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন — হিন্দুত্ব না ছেড়ে তিনি সমস্ত প্রগতিশীল কার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন — ধর্মের দিক দিয়ে নয়, চিন্তার ও বিশ্লেষণের দিক দিয়ে। তিনি ছিলেন মানবিকতার অনুশীলনপন্থী। হিন্দুত্ব তাঁর যতই প্রবল হোক, যুক্তির প্রাধান্য তিনি সর্বদাই মেনে নিয়েছেন, এই জন্যই দেখতে পাই নিরীশ্বর সাংখ্য, তার যুক্তি দিয়ে বঙ্কিমকে অভিভূত করেছিল। যুক্তির চাপে তাঁর মধ্যে নাস্তিকতাও দেখা দিয়েছিল, কিন্তু শেষে বলেছেন,"ধর্ম ও ঈশ্বর-বিশ্বাস অবিভাজ্য।" বঙ্কিম সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, কিন্তু সে যুগের উদারপন্থীদের সঙ্গে তাল রাখতে পারেননি — আসলে হিন্দুয়ানী তাঁকে এমন ভাবে উজ্জীবিত করেছিল যে কেবল

---

১. কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার, দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জি ও তারাচাঁদ চক্রবর্তী।

রাজনীতি নয়, তাঁর সমস্ত চিন্তাধারার মূলমন্ত্র ছিল হিন্দু ন্যাশনালিজম্। এইখানেই কেশব সেনের সঙ্গে তাঁর একটা প্রকাণ্ড ব্যবধান, যদিও কেশব সেনের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় প্রীতি ছিল (একই বৎসরে ১৮৩৮ সনে দুজনেরই জন্ম হয়)। আমরা উনিশ শতকের সমাজে দেখি — একদিকে মুক্ত মনের প্রচুর অভিব্যক্তি, আবার অন্যদিকে দেখি রাধাকান্ত দেবের (যিনি শিক্ষার প্রসারে এবং অন্যান্য প্রগতিশীল ব্যবস্থায় অগ্রণী ছিলেন কিন্তু সতীদাহ প্রথা সমর্থন করেছিলেন[১]), রামকমলের, মহর্ষির, বঙ্কিমচন্দ্রের, ভূদেবের, রাজনারায়ণের, হিন্দুত্বে রক্ষণশীলতা।

এই সময়েই আমরা দেখতে পাই বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষিত লোকদের চিন্তার মধ্যে অনেক ইউরোপীয় দার্শনিক তত্ত্ব আনাগোনা করছিল যেমন, স্পেনসারের অ্যাগনস্টিসিজ্‌ম্, কোঁতের পজিটিভিজ্‌ম্, বেন্থামের ইউটিলিটারিয়ানিজ্‌ম, মিলের র‍্যাশনালিজ্‌ম্, আবার অন্যদিকে বৌদ্ধদের শূন্যবাদ, চার্বাকের নাস্তিক্যবাদ, শঙ্করের অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ, ভক্তিবাদ ইত্যাদি। এই সকল মতবাদের আলোচনা ও স্থানেস্থানে স্বীকৃতি, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার মুক্তমনের ও জীবনীশক্তির প্রকাশ — চিন্তাজগতের সম্পদ। আমাদের মনে রাখতে হবে এ সবই বাংলা দেশের হিন্দুসমাজের প্রথম স্তরেই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল — তাও সম্পূর্ণ নয় — দ্বিতীয় স্তরে কেবল একটু চনমনে ভাব এসেছিল, উপর স্তরের অলোড়নের ফলে; তবুও বলবো — এটা নবজাগরণ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে মহর্ষির এবং ব্রহ্মানন্দের ধর্ম-চিন্তা, ধর্মাচরণ, উদ্বেলিত হৃদয়ের ভক্তির বন্যা, কেশবের সর্বধর্মসমন্বয়-

১. আরও আশ্চর্য যে বর্তমানেও এমন নবীন সাহিত্যিক ও লেখক বাংলা দেশে আছেন যিনি রাজা রামমোহন রায়ের উপরে এমন অসাধু বক্রোক্তি করতে পারেন, "তাঁর সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে জেহাদ যেমন ব্যক্তিগত অ ভক্ততাসঞ্জাত তেমনি ইংরাজী চিন্তাভঙ্গিপ্রসূত। লোককে পুড়িয়ে মারতে ইংরাজদের তখন লজ্জা হচ্ছিল।" (বিনয়কৃষ্ণ দত্তের ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বরূপ)

বাণী সবই মুক্তমনের প্রকাশ। মহর্ষি ব্রহ্মোপাসনাকে, ব্রহ্মসাধনাকে ও উপাসকদের কর্তব্যবিধিকে বিশিষ্ট আকার দিলেন, ব্রহ্মানন্দ উপাসনাকে ধর্মজীবনের ভিত্তিতে স্থাপন করলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে জীবনীশক্তি দিতে লাগলেন। কেবল ভারতে নয়, সমগ্র পৃথিবীতে কেশব এই নূতন ধর্মের বার্তা ছড়িয়ে দিলেন — ইংলণ্ডে নিজে গিয়ে সমস্ত ইংলণ্ডে ব্রাহ্মধর্মের বাণী ঘোষণা করলেন। এই ব্রহ্মবাদ প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যের পুনর্বিন্যাস মাত্র — তথাপি এর স্বীকৃতি অতিমন্থর। এ সব উনিশ শতকের সমাজ ও ধর্মচিন্তার ঐতিহাসিক চিত্র। আমরা দেখলাম কত বড় বড় মনীষীদের চিন্তার ও কর্মসাধনার নিজ নিজ রূপ বঙ্গবাসীদের তথা সমস্ত ভারতীয়দের উন্নততর জীবন লাভের দিকে এগিয়ে দিল। শঙ্করের ব্রহ্মবাদ বেদ থেকেই উদ্ভূত, কিন্তু বহু শতাব্দীর লোকাচার সম্পর্কিত অনুষ্ঠানসমূহ ক্রমে ক্রমে পৌত্তলিকতায় এসে দাঁড়িয়েছিল। বহু শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করে এবং এবং তার ভিতরে প্রবেশ করে রাজা ব্রহ্মবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন এবং ভারতে নূতন যুগ আনলেন। শঙ্করের ব্রহ্মবাদকে বিস্মৃতির গর্ভ থেকে উদ্ধার করে রাজা রামমোহন যে-চিন্তাভাণ্ডার হিন্দুদের কাছে উপস্থাপিত করলেন সেই থেকে নূতন পথ দেখা দিল। সেই পথের মনীষীরা — মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশব, পরমহংস রামকৃষ্ণ, শ্রীঅরবিন্দ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইত্যাদিরা নিজ নিজ প্রতিভা দিয়ে ভারতের ভবিষ্যতের দৃষ্টি সম্প্রসারিত করে দিয়ে গেছেন। এঁদের পরের স্তরে, সে উদারতা হয়তো সর্বক্ষেত্রে ছিল না, কিন্তু অনেকেরই বহুমুখী প্রতিভা ছিল। পূর্বেই বলেছি এইসব সমাজসংস্কারকরা (আদি ব্রাহ্মসমাজের, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের) কী গুরুভার বহন করে নিয়ে চলেছিলেন — সমাজে অসবর্ণ-বিবাহ চলেছে, বিধবা-বিবাহ চলেছে, বহু অতিশয়তা ভিন্ন ভিন্ন রূপে সমাজে দেখা দিয়েছে,

আবার অন্যদিকে রামকমল সেন থেকে আরম্ভ করে, রাজা রাধাকান্ত দেব, শশধর তর্কচূড়ামণি ইত্যাদি গোঁড়া হিন্দুরা, বড় বড় সুশিক্ষিত সাহিত্যিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, পণ্ডিতরাও এই সব পরিবর্তনের বিরোধিতা করে চলেছেন এবং অনেকক্ষেত্রে স্বীকৃতিও দিয়েছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে কত সমস্যা— ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া উচিত কি না — ইংরাজী ভাষার উপরে কতটা জোর পড়া উচিত — সংস্কৃতশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কতটা — কর্মক্ষেত্রে এই ভাষার মূল্য আছে কি না — দর্শনাদি শিক্ষার কতটা প্রয়োজন — বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার কি পরিমাণে হওয়া বিশেষ প্রয়োজন — পৌরনীতি ক্ষেত্রে, অর্থনীতিক্ষেত্রে দেশবাসীদের দাবী কতটা অবিসম্বাদিত, এই সকল সমস্যা এসে বাঙলা সমাজকে তোলপাড় করেছিল। একদিকে দেশে সমস্যার পর সমস্যা, দেশের দারিদ্র্য, শাসকদের শোষণনীতি, শিক্ষাক্ষেত্রে দুই আদর্শের সংঘাত, অন্যদিকে সমাজে রক্ষণশীলতার প্রভাব সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের নৈতিক আদর্শ ও স্বাধীন চিন্তার উন্মাদনা। বাংলার এই পরিস্থিতিতে এলেন অতুলপ্রসাদ এবং প্রায় বিশ বৎসর এই আবহাওয়ায় কৈশোর কাটিয়ে যৌবনে পদার্পণ করবার সময় তিনি বিদেশে গেলেন — সেখানে গিয়ে আবার সম্পূর্ণ নূতন পরিস্থিতি।

অতুলপ্রসাদের পিতা রামপ্রসাদ সেন, মহর্ষির কাছ থেকে একেশ্বরবাদ মন্ত্র নিয়েও, কিছু দিন পর, কেশবচন্দ্রের নূতন আদর্শে (নববিধানে) প্রভাবিত হয়েছিলেন। প্রথম প্রথম ঢাকায় প্রতি রবিবারেই তাঁর বাড়ীতে নববিধানের উপাসনা হতো। পিতার মৃত্যুর পর পারিবারিক বিপর্যয়ের মধ্যে তাঁরা পড়লেন। নিজেদের বাড়ীতে আর্থিক অসঙ্গতি, মাতুলালয়ের প্রাচুর্য, পিতার ভক্তিজীবনের স্মৃতি, অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুদের সামাজিক আভিজাত্য, মাতামহের সাধুজীবন, নিজের দায়িত্ববোধ, এই সব একত্র হয়ে অতুলপ্রসাদের কৈশোরকে

এমন ভাবে আলোড়িত করেছিল যে তাঁর মানসিক চঞ্চলতা, বিদেশে শিক্ষার সফলতা অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত বর্তমান ছিল। সফলতার পর জীবনে একটা নূতন অধ্যায় এলো — ব্যক্তিত্ব নূতন রূপ নিল — ভবিষ্যতের চিত্র বদলে গেল। এত দিনের অন্ধকার, অনিশ্চয়তা কেটে যাওয়ায় জীবনে অবলম্বন পেলেন — নিজগুণে উচ্চ সমাজে স্থান পেতে লাগলেন। এখন অতুলপ্রসাদের যেমন আনন্দ, তেমনি দায়িত্ব। একদিকে, তিনি নব্য ব্যারিস্টার যুবা, মনোরম দীপ্তিমান্ মুখশ্রী, সংযত ব্যবহার, সসম্ভ্রম আত্মপ্রকাশ, অন্যদিকে, তিনি সুকণ্ঠ, সুরকার ও সঙ্গীত-পিপাসু। তাই অতুলপ্রসাদের পক্ষে সমাজের সর্বোচ্চ আসরে স্থান পেতে দেরী হলো না — যেখানে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, জগদিন্দ্রনাথ (নাটোরের মহারাজা), লোকেন পালিত, সত্যেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ ইত্যাদিরা বেশ জমাট করে বসতেন। একদিকে যেমন এ আসরে স্থান পেয়ে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করলেন, তেমনি অন্যদিকে, উচ্চশিক্ষিত ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজে বিবাহযোগ্যা যুবতীদলের মধ্যে (তার চেয়ে বেশী, যুবতীদের মাতৃমহলে) একটা বিশেষ স্থান এসে গেল, যা অতুলপ্রসাদের মোটেই ইচ্ছাকৃত নয় — বরং তিনি অতি দূরে থাকবারই চেষ্টা করেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের মেয়েমহলে একটা চঞ্চলতা সৃষ্টি হলো। তৎকালীন অত্যন্ত ফ্যাসনেব্‌ল্, অধুনা বার্ধক্যের কোঠায় যথেষ্ট এগিয়েছেন, এমন একটি উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ ঘরের মহিলার মুখে শুনেছি যে, যেদিন ব্রাহ্মদের মধ্যে জানা গেল যে অতুলপ্রসাদ হেমকুসুমের গলায় বিবাহের মালা দিলেন সেদিন, তাঁর মনে আছে, ব্রাহ্মমহিলামহলে আশা ও আনন্দ কিছুদিনের জন্য ম্লান হলো। স্কট্‌ল্যাণ্ডে গ্রেটনা-গ্রিনে বিবাহ হলো মাতুল-কন্যার সঙ্গে (সে সময়ে এ বিবাহ আমাদের দেশে অপ্রচলিত ছিল — বর্তমানে এ রকম বিবাহ চলেছে)। তাই আমরা দেখতে পাই যুগের চঞ্চলতার আতিশয্য এ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে — স্বাধীন চিন্তা সমাজকে ডিঙিয়ে,

অতুলপ্রসাদকে পেয়ে বসলো। সেদিন কি দূর-ভবিষ্যৎ গোপনে হেসেছিল? প্রতিক্রিয়া যদি হয়, আশ্চর্যের নয়।

অতুলপ্রসাদের একেশ্বরবাদে বিশ্বাস ছিল, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও সর্বধর্ম-সমন্বয়ে বিশ্বাস ছিল, যুক্তি ছিল, ভক্তি ছিল, আত্মবিশ্বাস ছিল, চরিত্রের ও মতের দৃঢ়তা ছিল—এই সবই উনিশ শতকের বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমাজের বিচিত্ররূপের প্রকাশ। অতুলপ্রসাদের জীবনে এই যুগের ক্ষীণ ছায়া দেখতে পাই।

অতুলপ্রসাদ — কবিতা ও গান

প্রথম থেকেই অতুলপ্রসাদের গানের আসরে ও সাহিত্য আলোচনার বৈঠকে আমি স্থান পেয়েছিলাম। কখনো কখনো সেন মশায় কোন বিষয়ের অবতারণা করতেন, কখনো কখনো রাধাকমল বাবু, কখনো কখনো ধূর্জটিবাবু সাহিত্যের কোনো তত্ত্ব নিয়ে কিছু বলতেন, আর আমরা সকলে মিলে তার আলোচনা করতাম। কলকাতার সাহিত্যের আসর থেকে যে বাক্-বিতণ্ডা উঠতো, সেগুলি নিয়েই বেশীর ভাগ সময় আলোচনা হতো। আমাদের প্রত্যেক বৈঠকেই সেন মশায়কে দুতিনখানা গান গাইতেই হতো—তিনিও মনের আনন্দে গাইতেন — আমাদের দিক্ থেকে ফরমায়েস কম হতো না। যদিও সেন মশায় সাহিত্যে খুবই রস পেতেন, তবুও মুখ্যত তিনি গীতিকার, সুরবিন্যাসী, সরল স্বভাবকবি। গীতিকবিতার পদলালিত্যের উৎকর্ষতার জন্য অথবা ভাবের গভীরতার জন্য তাঁর কবিতা খ্যাতিলাভ করেনি, করেছে একান্ত সাদা ভাষায় প্রাণের কথা গানে প্রকাশ করায়, --সুরের আবেশের[১] সঙ্গে মন স্বতঃই ধ্বনিত হওয়ায়। কতকগুলি

১. রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন — "…গুণ্ গুণ্ করিতে করিতে যখনই একটা

কবিতার উচ্চভাব অতুলপ্রসাদ এমন সাধারণ ভাষায় পরিস্ফুট করেছেন যে সেটা সর্বদা লক্ষিত হয় না। ভাব যখনই ভাষাতে রূপ পেলো, সুর এসে আশ্রয় নিল, গানটি মনোমোহকর হয়ে দাঁড়াল — তখনই আমরা পূর্ণতার আস্বাদ পেয়েছি — যেমন,

বাউল

মিছে তুই ভাবিস মন,
তুই গান গেয়ে যা, গান গেয়ে যা আজীবন,
পাখীরা বনে বনে, গাহে গান আপন মনে,
নাই বা যদি কেহ শোনে, গেয়ে যা গান অকারণ···

আবার যেমন, —

দেশ

প্রভাতে যারে নন্দে পাখী,
কেমনে বল তাঁরে ডাকি ?
কোন্ ভরসায় তাঁহারে মাগি ?
কুসুম লয়ে গন্ধ বরণ
নিতি নিতি যারে করিছে বরণ,···

কবিদের উক্তি ছাড়াও এটা বুঝতে কষ্ট হয় না যে, মুক্ত মনে যে-ভাব ও সুর যুগপৎ আসে এবং যে-কবিতা সেই ভাব থেকে সৃষ্ট হয় তার মান স্বভাবতই উচ্চ। মুক্ত মন বলতে এই বোঝা যায় যে, অবান্তর কতকগুলি চিন্তা যখন মনের মধ্যে নেই, অথচ কোনো এক বিশেষ ভাব মনের মধ্যে আনাগোনা করছে, সেই অবস্থায় যে-কবিতা

লাইন লিখিলাম 'তোমার গোপন কথাটি সখি রেখো না মনে" তখনই দেখিলাম সুর যে যায়গায় কথাটা উড়াইয়া লইয়া গেল, কথা আপনি সেখানে পা'য়ে হাঁটিয়া গিয়া পৌছিতে পারিত না। তখন মনে হইতে লাগিল আমি যে গোপন কথাটা শুনিবার জন্য সাধাসাধি করিতেছি······তাহা যেন সমস্ত জলস্থল আকাশের নিগূঢ় গোপন কথা।"

এলো সেটাকে আমরা বলবো প্রাণধর্মী অর্থাৎ প্রাণের আবেগে যার জন্ম। কেউ লিখতে বলেছে বলে নয়, কোন বিষয় লিখতে হবে বলে নয়, স্বতঃই যে-ভাব মনের মধ্যে এলো, প্রাণের মধ্যে সাড়া তুললো, সেগুলিই প্রাণধর্মী। যেমন,

ভৈরবী

কি আর চাহিব বল, হে মোর প্রিয়,
তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও।
বলিব না "রেখো সুখে", চাহ যদি রেখো দুখে
তুমি যাহা ভাল বোঝ তাই করিয়ো···

আবার যেমন,

বেহাগ

এত হাসি আছে জগতে তোমার,
বঞ্চিলে শুধু মোরে
বলিহারি, বিধি, বলিহারি যাই তোরে ?···

আবার যেমন,

খাম্বাজ

আমারে ভেঙ্গে ভেঙ্গে কর হে তোমার তরী
যাতে হয় মনোমত তেমনি করে লও হে গড়ি···

আবার যেখানে কবির কণ্ঠে প্রথমে সুর এসেছে এবং তাকে বাঁধবার জন্য ভাব ও ভাষা এলো, তখন তাকে বলবো সুরধর্মী — সেখানে সুরই গীতিকারকে পেয়ে বসেছে — কবিতার উৎকর্ষতা[১] অথবা ভাবের গভীরতা মুখ্য নয় — গৌণ। যেমন,—

---

১. রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন — "······গীতিকথার নিজেরই একটা বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ কাজ আছে। গানে যখন কথা থাকে, তখন কথার উচিত হয় না, সেই সুযোগে গানকে ছাড়াইয়া যাওয়া, সেখানে সে গানেরই বাহক মাত্র। গান নিজের ঐশ্বর্যেই বড় — বাক্যের দাসত্ব সে কেন করিতে যাইবে ?"

মিশ্র পরজ ভৈঁরো

বিধি, আর ত তোমায় নাহি ডরি,
আমি পেয়েছি অকূলে আজি তরী।
যবে কণ্টক-তরু তলে, ভাসাবে নয়ন জলে,
আমি কুসুমে দিব গো তারে ভরি।...

আবার, মিশ্র তিলক কামোদ কীর্তন

জানি জানি তোমারে ওগো রঙ্গরাণী,
শূন্য করি লইবে মম চিত্তখানি,
এসো গো মম অন্তরে,
ধীরে মৃদু মন্থরে, বিদ্যুৎ চমকে...

কবিতার উৎকর্ষতার অভাব বলবো তখন, যখন দেখা দেবে ভাবের বিচ্ছিন্নতা অথবা রূপকের বহুলতা অথবা অর্থের অপূর্ণতা। যেমন,—

মিশ্র বেহাগ

একা মোর গানের তরী ভাসিয়ে ছিলাম নয়ন জলে,
সহসা কে এলে গো এ তরী বাইবে বলে?
যা ছিল কল্পমায়া সে কি আজ ধরল কায়া...

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুরধর্মী — কবিতায় দেখতে পাই যে সুর তাঁর প্রথমে এসেছে আর সঙ্গে সঙ্গে ভাষা কখনো রবীন্দ্রনাথ কখনো অক্ষয় দত্ত জুগিয়েছেন।

অতুলপ্রসাদের কতকগুলি গান আছে যেগুলি, আমার মনে হয়, ভাবের গভীরতায় উচ্চাঙ্গ এবং সুর মাধুর্যেও অতুলনীয়। যেমন,

নায়েকী কানাড়া

তব পারে যাবো কেমনে হরি
দুস্তর জলধি, নাহি তরী
আছি বসে — একা ভব তীরে
ঘোর তিমির...

খাম্বাজ

কেন যে গাহিতে বলে, জানে না
জানে না তারা,
যে সুরে গাহিতে চাহি, আমি
যে সে সুরহারা,
যে সুরে শিশুরা হাসে···

আবার,

জয়শ্রী

ক্ষমিয়ো হে শিব, আর না কহিব
দুঃখ বিপদে ব্যর্থ জীবন মম,
মৃত্তিকা বলে মোরে, ওরে মূঢ় নর···

আবার,

বেহাগ

তুমি গাও, তুমি গাও গো
গাহ মম জীবনে বসি বেদনে বাঁধা
জীবন বীণা···

গীতিকবিতা (লিরিক) রচয়িতা অতুলপ্রসাদ এমন গানও লিখেছেন, যা লিরিক পর্যায়ে পড়েও নিতান্ত আত্মগত ভাব ছাড়িয়ে, বিশ্বের ব্যথিত হৃদয়ের প্রার্থনা নিয়ে আরাধ্যের উদ্দেশ্যে নিবেদন জানিয়েছে। তাঁর এইভাব-প্রধান কবিতা অতি সাধারণ কীর্তনাঙ্গ সুরে, কিন্তু কী হৃদয়গ্রাহী, নম্রতাজ্ঞাপক ! তিনি গেয়েছেন,

যখন মানবের বিচারশালায়
অবিচার পাব দান,
যখন লুকানো নিন্দা আমারে
আঁধারে হানিবে বান,
সহিব নীরবে, কহিব তখন
তুমি জান, নাথ, তুমি জান।

ভবের সভায় যশের মুকুট দেয়
যদি তারা শিরে,
পারি যেন দিতে সরল বিনয়ে
তাদের চরণে ফিরে,
বলি যেন তবে — হীনতা আমার
তুমি জান, নাথ, তুমি জান···

এই আলোচনায় আমরা মেনে নিয়েছি যে সঙ্গীতে সুরের প্রাধান্য অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু এটাও স্বীকার করতেই হবে যে সুরের রূপ একটা স্থায়ী রূপ — এই স্থায়ী সুরের কাঠামোটি একা দাঁড়িয়ে মানুষকে চিরকাল আনন্দ দিতে পারে না — যে-আনন্দ এই সুরই দিতে পারবে, যখন, বিভিন্ন গীতিকবিতার ভিতর দিয়ে সেই সুরটিই প্রকাশ পাবে। সুতরাং গীতিকবিতার ভাষা একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে। মানুষের প্রাণ ভাষাকে চায়, হৃদয়গ্রাহী ভাব চায় — সুরকে অবহেলা করে নয়।

অতুলপ্রসাদের গান আমাদের কাছে এত শ্রুতিমধুর লাগে, এই জন্য, যে তিনি তাঁর গানের মিষ্টতা বাড়িয়েছেন সুরের মিশ্রণ করে, যেখানে প্রয়োজন বোধ করেছেন। শুদ্ধ সুরে কখনও কীর্তন জুড়ে দিয়েছেন, কখনো লখনৌ ঠুংরীর[১] গায়কী মিশিয়েছেন, কখনো বাংলা দেশের গ্রাম্য সুর লাগিয়েছেন — তাঁর শ্রুতিতে অথবা কণ্ঠে যা' ভাল লেগেছে — তাই তিনি মিশিয়েছেন — আবার অনেক শুদ্ধসুরও রেখে দিয়েছেন। পুরোণো-পন্থী-গাইয়েরা এসব মিশ্রণ সহ্য করেন না, কিন্তু বাংলার কবিদের মতে গানগুলি রসসৃষ্টি করে বলে তাঁরা নূতন সম্পদ

১. শ্রাবণ ঝুলাতে বাদল বাতে······ (পিলু), চাঁদিনী রাতে কে গো আসিলে···(পিলু), আমারি বাগানে এত ফুল······ (খাম্বাজ) গীতগুলির সুরের রূপ কি ভাবে বিভিন্ন ঢং-এর ও গায়কীর যোগে কতটা রসসৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে তার আলোচনার জন্য শার্ঙ্গদেবের (রাজ্যেশ্বর মিত্রের) লেখা অতুলনীয়।

রূপেই মনে করেন। অতুলপ্রসাদের সব কবিতাই অতি সরল — খোলা প্রাণের স্বাভাবিক প্রকাশ, ভাষায় কোনো দুর্বোধ্যতা নেই — তাই সোজাসুজি মনে সাড়া জাগায়। প্রত্যেকটি গানের ভাষা সহজ এবং কবি নিজে গায়ক বলে এমন সুমিষ্ট সুরসজ্জায় ভূষিত করেছেন যে প্রতিটি গান নিজস্ব সুষমামণ্ডিত। প্রাণস্পর্শী ভাষাতে যদি সুরযোজনা সুসঙ্গত হয় তবে সে গান শুনে শ্রোতার মন স্বতঃই দ্রবীভূত হয়ে পড়ে। অতুলপ্রসাদ যে বাংলাভাষার সব চেয়ে দরদী কবি এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথও কোনও অংশে কম দরদী নন — তাঁর কতকগুলি গান আছে যেগুলি শ্রোতার মনকে এমন ভাবে অভিভূত করে যে প্রাণ যেন নিস্পন্দ হয়ে যায়। তবুও কেন যেন অনুভব করি অতুলপ্রসাদের গানে কি যে একটা বিশেষত্ব আছে ; যাতে মনে হয় — তিনিই 'সাধারণ লোকের বেশী নিকটে — বেশী আপন — কথাগুলি চলতি ভাষা বলে কানে লেগে থাকে, গুণ গুণ করা সহজ হয়। মানুষের সুখ দুঃখ নিয়ে সহজ কবিতা অতুলপ্রসাদের একটা বিশিষ্টতা। তাঁর কবিতার সংখ্যা খুবই কম, কিন্তু তার বেশীর ভাগই অনুভূতি মাখানো। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের — কয়েক হাজার কবিতার মধ্যে মানুষের আশাও নিরাশা-মাখা কবিতা অনুপাতে কম। তাঁর অতুলনীয় কবিতার বেশীর ভাগ পূজা, প্রার্থনা, প্রেম, সমর্পণের গান — আরাধনা ও আকুতির ব্যঞ্জনা। অতুলপ্রসাদের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের বর্ণচ্ছটা নেই, ভাবের বৈচিত্র্য নেই, জন্মমৃত্যুর রহস্য ইঙ্গিত নেই, গূঢ় অন্তর্দৃষ্টি নেই — কিন্তু আছে তাঁর কবিতায় অফুরন্ত সমবেদনা, আশা, আকুতি, ভালবাসা, আর আছে মৈত্রী ও প্রাণের আবেগ। অতুলপ্রসাদ সুন্দরের উপাসক, প্রেমের পূজারী, ব্যথার ব্যথী, দুঃখনৈরাশ্যের অন্তরতম শুচিতার প্রতীক। আশার গান, আকুতির গান, বিষাদের গান, প্রেমের গান, আনন্দের গান, সঙ্গীত-মানসীর মধ্যে আত্মবিলীনের গান গেয়ে — বাংলা দেশের সঙ্গীত

ভাণ্ডারে অপূর্ব দান রেখে গেছেন। কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে বলছি এই যে, বাংলা দেশে যে সব কবি লিরিকে উচ্চস্থান অধিকার করেছেন, তাঁদের মধ্যে অতুলপ্রসাদকে শ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে। দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনী সেন, কাজী নজরুল, সত্যেন দত্ত, যতীন বাগচী, কুমুদ মল্লিক তাঁদের কবিতা দিয়ে — বাংলা দেশকে সাহিত্য জগতে ঐশ্বর্যশালী করেছেন — এঁরা সকলেই বরেণ্য। দ্বিজেন্দ্রলাল অতি অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন — লিরিক তাঁর সর্বতোমুখী প্রতিভার একটি দিক মাত্র। তাঁর কয়েকটি গীতিকবিতা (লিরিক) অতিশয় খ্যাতি অর্জন করেছে, আর হাসির গানে তাঁর অবদান বাংলা সাহিত্যের একমাত্র সম্পদ। সাহিত্যের অন্যদিকে তাঁর দান এ স্থানে আনবো না। কাজী নজরুল অনেক বেশী লিরিক লিখেছেন, কিছু লিরিক বিশেষ খ্যাতিও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে — কতকগুলি বেশ উচ্চমানের — সেগুলি বাংলা ভাষার গৌরব। তাঁর দেশাত্মবোধক গান বলিষ্ঠ ও কবিতাগুলি অনেকদিন থেকেই খুব হৃদয়স্পর্শী হয়েছে। সত্যেন্দ্র দত্ত ছড়ার কবি হিসেবে বাংলা সাহিত্যে সম্মানের স্থান অধিকার করেছেন। তাঁর কবিতাগুলি সঙ্গীতধর্মী নয় — তাই আমি বলি, তিনি ঠিক্ লিরিসিস্ট্ নন্ — তিনি ছন্দের রাজা কিন্তু সুরের কাঙাল। ইংরাজীর অধ্যাপকেরা বলেন সত্যেন্দ্র দত্তের কয়েকটি কবিতা লিরিকের সংজ্ঞায় পড়ে। আমার মতে তাঁর সব কবিতাতেই ছড়াছন্দের প্রাধান্য পেয়েছে। মোটকথা লিরিক রচয়িতাদের মধ্যে যাঁরা বিশিষ্ট দরদী কবি বলে খ্যাত, তাঁরা হলেন (রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে) অতুলপ্রসাদ, রজনী সেন, যতীন বাগচী, দ্বিজেন্দ্রলাল, দেবেন সেন, কুমুদ মল্লিক। আরও অনেক ভাল ভাল কবি আছেন যাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য কিন্তু সেটা আমাদের বিষয়ীভূত নয়। বহুজন পরিচিত প্রাচীন কবি দাশরথী রায়ের ও নিধুবাবুর টপ্পার কিছু অংশ লিরিকের পর্যায়েই পড়ে এবং সেই সব উচ্চাঙ্গ গানের গৌরব

চিরকালই বঙ্গদেশে অক্ষুণ্ণ থাকবে। লিরিকের জনপ্রিয়তার কারণ মানুষের জীবনে কোনো কোনো বিশেষ সময়ে কোনো এক বিশেষভাব স্বতঃস্ফূর্ত হয় এবং সেই আত্মগত ভাবটিকে মূর্ত করবার জন্যই — লিরিকের জন্ম — লিরিকের ভাষায় মিষ্টতা ও দরদ থাকে কারণ এটা অন্তরের ভাবাবেগের প্রকাশ। কবি এই লিরিকে শুদ্ধসুর দিতে পারেন আবার মিশ্রণও করতে পারেন, কবির অন্তরের তাগিদে। এই যে মিশ্রণ, এই-যে সুরবিন্যাস তার স্বাধীনতা রবীন্দ্রনাথই ছেলেবেলা থেকে দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভাশালী কিশোরের পক্ষে এ সাহস সম্ভব হয়েছিল — যে-কবি বারো-তেরো বৎসর বয়স থেকেই উচ্চাঙ্গ কবিতা ও গান লিখেছেন, তাঁর ভাষা ও ছন্দ যে প্রতিভার সঙ্গে তাল রেখে চলবে এবং বাইরের কোনো বাধা মানবে না, এটাতো স্বাভাবিক। অতুলপ্রসাদও দশবারো বৎসর বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তা ছাড়া তাঁর একটা নিজস্ব ছাপ দিল বলেই গানগুলো এত প্রিয় হয়েছে। এই দুই জন কবির জীবন কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক রকমের। এই দুই জনের সাধনাক্ষেত্রের উপাদানেও যথেষ্ট তফাৎ ছিল — পারিপার্শ্বিক অবস্থাও সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। রবীন্দ্রনাথ, যাঁর পিতামহ বিখ্যাত ধনী, দাতা, সমাজনেতা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, যাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, যাঁদের বাল্যকাল কেটেছে ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ছত্রছায়ায়, প্রাচীন শিক্ষাদীক্ষার আবহাওয়ায়, সেই রবীন্দ্রনাথের জীবনের পুষ্টির উপাদান আর অতুলপ্রসাদের পুষ্টির উপাদান সম্পূর্ণ ভিন্নরকমের, কারণ অতুলপ্রসাদের পারিবারিক অবস্থা খুবই সাধারণ ছিল। আমরা দেখতে পাই, রবীন্দ্রনাথের কবিতায় অতুল ঐশ্বর্য, দীপ্তি, প্রতিভা, চিন্তার গভীরতা আর অতুলপ্রসাদের কবিতায় দেখতে পাই, সহজ প্রাণখোলা আত্ম-প্রকাশ ও আত্মনিবেদন। সঙ্গীতের দিক থেকেও দেখা যায় বাল্যকাল থেকেই দুজনার পরিবেশের কত তারতম্য। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতের

ঘরে জন্মেছেন, সঙ্গীতের মধ্যেই লালিত পালিত — যদিও সে সঙ্গীত মার্গসঙ্গীত। রবীন্দ্রনাথের পিতা ও ভ্রাতারা হিন্দুস্থানী উচ্চসঙ্গীতে অভিজ্ঞ ছিলেন [১] সুতরাং সঙ্গীতের আবহাওয়ার মধ্যে যাঁর শৈশব কেটেছে এবং কাব্যপ্রতিভা যাঁর মধ্যে প্রদীপ্ত, তাঁর মধ্যে ভাষা ও সুর যে যুগপৎ মিলিত হবে তা খুবই স্বাভাবিক। অন্যদিকে, অতুলপ্রসাদ পরিবারের একমাত্র পুত্র — পরিবারে সঙ্গীতের আবহাওয়া ছিল না বললেই হয়, তবুও বাঁশীবাজান, গানগাওয়ার অন্তরের আবেগ ও ইচ্ছা ছিল বলে সঙ্গীতপ্রিয় বলে সুনাম ছিল। বাল্যকালে মাতুলালয়ে বেড়াতে যেতেন, তখন মাতামহ খ্যাতনামা সাধু কালীনারায়ণ গুপ্তের সংস্পর্শে এসে গানের ইচ্ছাটা পরিস্ফুট হলো। পরে বারো-তেরো বৎসর বয়সে যখন অতুলপ্রসাদের পিতৃবিয়োগ হয় তখন তো তাঁকে মাতুলালয়ে গিয়েই থাকতে হলো। মাতামহ সঙ্গীতপ্রিয় ও সঙ্গীত

১. মহর্ষির রচিত প্রত্যেকটি বাংলা উপাসনা সঙ্গীত হিন্দি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চালে রচিত। মহর্ষি উপাসনা ও উৎসবের গানে উচ্চাঙ্গের হিন্দিসঙ্গীতের ঢংকেই উপযুক্ত মনে করিতেন বলে তিনি তার বেশী প্রাধান্য দিতেন। তাঁরই ইচ্ছা ও প্রভাবে তাঁর পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উচ্চাঙ্গের হিন্দি সঙ্গীত ভেঙে বহু ব্রহ্মসঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, তার মধ্যে ধ্রুপদের সংখ্যাই অধিক।...এই সব গান রচনায় বড় বড় ওস্তাদ সাহায্য করেছিলেন তার মধ্যে গৃহশিক্ষক বিষ্ণু চক্রবর্তী, রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তিপুরের রাজচন্দ্র ও যদুভট্ট বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া অন্যান্য গাইয়ে কোনো না কোনো সময়ে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীর গায়ক হিসাবে আশ্রয় পেয়েছিলেন। বাংলাদেশে বাইরের ওস্তাদদের মধ্যে বরোদার তৎকালীন বিখ্যাত গায়ক মৌলাবক্সও তাঁদের বাড়ীতে কিছুদিন ছিলেন। অযোধ্যা, গোয়ালিওর, মোরাদাবাদ থেকে ওস্তাদরা বাড়ীতে আশ্রয় নিতেন। যদুভট্ট সঙ্গীতের বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন ঠাকুরবাড়ীর উপর।

সেবী ছিলেন[১]*। এই দু'তিন বৎসর মাতামহের কাছে গীতচর্চা* হয়েছিল। এইমাত্র তাঁর সঙ্গীতের বুনিয়াদ। ঢাকায় অবশ্য মার্গ সঙ্গীতের চর্চা খুব হতো — গ্রাম্যসুরের গান, কীর্তন, পূজাপার্বণের গান ইত্যাদির গানের তো অন্ত নেই।

এর থেকেই বুঝতে পারা যায় যে রবীন্দ্রনাথের আর অতুলপ্রসাদের গানের প্রকৃতির কোথায় প্রভেদ। একজনের উচ্চবর্ণীয় গান, উচ্চচিন্তায় (intellectual appeal) উদ্বুদ্ধ করে, অভিজাত ভাষার মাধ্যমে যেটি পরিবেশিত হয়েছে আর একজনের (অতুলপ্রসাদের) গান বেশীর ভাগ সেই উচ্চবর্ণীয় গানই, গীতিপুষ্ট হয়ে আবেগভরা ভাষা দিয়ে জনগণের চিত্ত বিনোদন করে। অতুলপ্রসাদ অনেক লিখেছেন আমূল গ্রাম্যসুরে, যেমন বাউল, কীর্তন রামপ্রসাদী, ভাটিয়ালী, সাওয়ন, লাউনী, লগ্নি, কাজরী, গজল — আবার করেছেন কত মিশ্রণ — মিশ্র বেহাগ, মিশ্র পিলু, মিশ্র কালাংড়া, মিশ্র খাম্বাজ, মিশ্র দেশ, মিশ্র মল্লার, মিশ্র কানাড়া ইত্যাদি। আবার অনেক গান লিখেছেন শুদ্ধসুরে যেগুলি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসন অধিকার করে রেখেছে যেমন বেহাগ, পিলু, ভৈরবী, পূরবী, খাম্বাজ — আসোয়ারী, ললিত, আশাবরী, ভৈরো, জোনপুরী, জয়জয়ন্তী, সিন্ধু কাফি, দেশ, ভীমপলশ্রী ইত্যাদি। বেশীর ভাগ মিশ্রণেই ঠুংরীর ছোট্ট তান আর খোঁচ পাওয়া যায় — ঐ ঠুংরীর মিহি তানটুকু গানটিকে মনোগ্রাহী করে তোলে। অনেক গানে বাউল, আবার অনেক গানে কীর্তনের তুলাইন জুড়ে দিয়ে গানটিকে মনোগ্রাহী করে তুলেছেন। মূল সুরের সঙ্গে এই তিন চার রকমের সংযোগ অতুলপ্রসাদের গানকে এত মনোজ্ঞ করেছে। তাঁর কতগুলি গান থেকে অনুমান করতে পারি যে

১. তাই আমরা দেখতে পাই অতুলপ্রসাদের মাসী (সুবালা), মামাত বোন্ (সাহানা), মাসতুত বোন্দের (কনক, রেণুকা, উষা, টুলু, সতী) অনেকেই খুব ভাল গান গাইতেন।

তিনি লখনৌর আশে পাশে গ্রামে গিয়ে গ্রামের মেয়েদের ঐক্যতানে প্রভাবিত হয়েছিলেন — তার প্রমাণ, সাওয়ন, লাউনী, কাজরী ইত্যাদি। এজন্য গানগুলির মধ্যে কথার ভাষা, সুর স্বতঃস্ফূর্ত। অতুলপ্রসাদ কবি ও গীতিকার, কিন্তু মার্গসঙ্গীতের পিছুটান তাঁর খুবই কম ছিল, তাই তাঁর পক্ষে সুর-মিশ্রণে কোনো দ্বিধা ছিল না। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের একটা প্রচণ্ড পিছুটান[১] ছিল কিন্তু কাব্যপ্রতিভায় তিনি মিশ্রণ অজস্র করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে কত বিচিত্র সুরবিন্যাস করেছেন, কত বিচিত্র সুর লালিত্য এনেছেন, কতরকম ঢংএ সুরের অবয়বকে লীলায়িত করে শ্রুতিমধুর করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এই পিছুটান অগ্রাহ্য করে এগিয়ে গেলেন সাহিত্য প্রতিভার জোরে — সমাজের নূতন নূতন চিন্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সঙ্গীতকে জীবনের সঙ্গী করে নিতে। এই অন্তর্দৃষ্টির ফলে একদিকে যেমন মার্গসঙ্গীতের কড়া শাসন থেকে মুক্তি অর্জন[২] করলেন, অন্যদিকে তেমনি বর্জন করলেন

---

১. রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, — "জনশ্রুতি আছে যে আমি হিন্দুস্থানী গান জানিনে বুঝিনে। আমার আদি যুগের রচিত গানে হিন্দুস্থানী ধ্রুবপদ্ধতির রাগরাগিণীর সাক্ষীদল অতি বিশুদ্ধ প্রমাণ সহ দূর ভাবী শতাব্দীর প্রত্নতাত্ত্বিকদের নিদারুণ বাক্‌বিতণ্ডার জন্য অপেক্ষা করে আছে···সেই সঙ্গীত থেকেই আমি প্রেরণা লাভ করি একথা যারা জানে না তারাই হিন্দুস্থানী সঙ্গীত মানে না।"

২. রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, — "······আমার মনে আজ আর সন্দেহ নেই যে কলুর বলদের মত চোখে ঠুলি দিয়ে বাঁধা গণ্ডীর মধ্যে নিরন্তর ঘুরতে থাকা সঙ্গীতের সাহিত্যের কিম্বা কোনো ললিত কলার পরম সদগতি নয়। হিন্দুস্থানী কালোয়াতের কণ্ঠ ব্যায়ামের তারিফ করতে রাজী আছি এমন কি রসভোগ থেকেও বঞ্চিত হতে চাই নে। কিন্তু সেই রসচিত্তকে যদি মাদকতায় অভিভূত করে রাখে অগ্রগামী কালের নব নব সৃষ্টি বৈচিত্র্যের পিছনে আমাদের বিহ্বল ভাবে কাজ করে রেখে দেয়, খাঁচার পাখীর মত যা বুলি শিখেছি তাই কেবলই আউড়ে যাই এবং অবিকল আউড়িয়ে যাবার জন্য বাহাবা দাবী করি তা হলে এই নকলনবিশী বিধানকে সেলাম করে থাকবো তার থেকে দূরে — নূতন

কাব্যে অহেতুক ভাবালুতা ও ব্যথিত হৃদয়ের করুণ ভাবোচ্ছলতা। কাব্যধর্মী গান স্বভাবতই মনকে আর্দ্র করে, তার উপর যখন ভাব ও ও ভাষা উপযুক্ত সুরে মিলিত হয় তখন অতি সহজেই মন আন্দোলিত হয় এবং ভাবরসে বিভোর হয়ে পড়ে। অতুলপ্রসাদের গানের ক্ষেত্রেও ঠিক্ তাই — তাঁর গান শুনতে শুনতে হৃদয়ে একটা সাড়া অনুভূত হয়। কিন্তু এটা দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের কাব্যগুলি ভাবপ্রবণতাকে আদৌ স্থান দেয়নি। কিন্তু কল্পনাকে ও অন্তর্দৃষ্টিকে অজস্রভাবে রূপায়িত করেছে — বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ইঙ্গিত করেছে। এই বিশ্লেষণ ও রূপ যে কোনও সংস্কৃতিমান চিন্তাশীলের পক্ষে উপলব্ধির উপাদান। যেখানে ভাবের ঘনত্ব, চিন্তার বহুমুখী গতি সেখানেই প্রকাশের জটিলতা অনিবার্য এবং সেখানেই সুরের অকুণ্ঠ স্বাধীনতা নিতান্ত অপরিহার্য। বাংলার সঙ্গীতজ্ঞ কবিরা ক্রমবিবর্তনের পথ এইভাবে কেটে নিয়েছেন কারণ এটাই স্বাভাবিক। বহির্বঙ্গের সঙ্গীতজ্ঞ কবিরাও ভবিষ্যতে দেখতে পাবেন এটাই মার্গসঙ্গীতের অগ্রগতির পথ। বহির্বঙ্গের (দক্ষিণভারত বাদ দিয়ে) সঙ্গীতজ্ঞ কবি এত বিরল[১] যে, মার্গসঙ্গীতের জীবনীশক্তি কতটা আছে এবং কি ভাবে পরিবর্তনশীল পৃথিবীর কাছে থেকে আত্মরক্ষা করছে সেটা বুঝতে পারা শক্ত। নিশ্চয়ই মানতে হবে যে মার্গসঙ্গীত শূন্য থেকে অবতীর্ণ হয়নি — লোকসঙ্গীতেরই একটা পরিণত অবস্থা, তবে এটাও মানতে কষ্ট হওয়া মোটেই উচিত নয় যে, এই মার্গসঙ্গীতও কবির ও সঙ্গীতজ্ঞের আত্ম-প্রকাশের তাগিদে রূপান্তরিত হবে। যেখানে নূতনকে গ্রহণ করতে পারবে না, সেখানেই বুঝতে হবে জীবনীশক্তি মৃতপ্রায় — যতটুকু রূপান্তরিত হবে ততটুকুই তার জীবনীশক্তি ইঙ্গিত করে।

সাধনার পথে খুঁড়িয়ে চলবো সেও ভাল কিন্তু হাজার বছর আগেকার রাস্তায় শিকল বাঁধা শাগরেদী করতে পারব না।

১. গীতিকার হিসাবে নাম ছিল প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ সদারঙ্গ-এর।

আমি কলকাতার কয়েকটি আলোচনার আসর থেকে বুঝেছি যে কিছু সাহিত্যিক মনে করেন যে রবীন্দ্রনাথের গানের অনুকরণেই অতুল-প্রসাদ গান রচনা করেছেন। এ ধারণা মূলত ভ্রান্ত। কিছু কবিতার অন্তরের ভাব একই রকমের হওয়া স্বাভাবিক, কারণ বিষয়টা হয়তো জীবনদেবতার চরণে আত্ম-নিবেদন অথবা কবিতা-মানসীর প্রতি প্রেমের অর্ঘ্য। জ্ঞানের কেন্দ্রভূমিতে দাঁড়ালে ভাবের ঐক্য স্বাভাবিক। আসলে অতুলপ্রসাদের কবিতার কাঠামও আলাদা, ভাষার গাঁথুনীও আলাদা, প্রকাশভঙ্গীও আলাদা। অতুলপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন এবং ভালবাসতেন, কিন্তু কখনও অনুকরণ করার চেষ্টা করেননি, কারণ এ রাজ্যে অনুকরণের স্থান নেই, যেহেতু কবিতার উৎস কবির অন্তর্জগৎ। সমষ্টিগতভাবে দেখলে, অতুলপ্রসাদ হৃদয়বান্ ও আকুতিপূর্ণ ভাবুক আর অধ্যাত্ম-ভাবনাপুষ্ট রবীন্দ্রনাথ মিস্টিক ও নিরন্তর তত্ত্ব-পিপাসু। রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রভাব অতুলপ্রসাদের কবিতায় খুব কমই পড়েছে, কিন্তু একেবারে পড়েনি এ তো সম্ভব নয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এড়াতে পারেননি — "অন্যে পরে কা কথা।" আমার মনে হয়, মাত্র কয়েকখানা কবিতা এমন রচনা করেছেন যেগুলি রবীন্দ্রনাথ ঘেঁষা। আমরা যেমন দেখতে পাই, রবীন্দ্রনাথের ছায়া অতুলপ্রসাদের কবিতার উপরে —

'ওরে বন তোর বিজনে সঙ্গোপনে
কোন উদাসী থাকে ?
আমার মনের বনের উদাসীরে
ডাকে সে আজ ডাকে।
নিজে সে নীরব হয়ে রয়,
শোনে সে ফুল যে কথা কয়,
তরুর হিয়া আলিঙ্গিয়া লতার অনুনয়।...

আবার যেমন,

কে হে তুমি সুন্দর অতি সুন্দর অতি সুন্দর
কভু নবীন ভানু ভালে
কভু ভূষিত নীরদ মালে
কভু বিহগ কুজিত কুহক কণ্ঠে
গাহিছ অতি সুন্দর···

আবার যেমন,

আপন কাজে অচল হলে, চলবে না রে চলবে না,
অলস স্তুতি গানে (তাঁর) আসন, টলবে না রে টলবে না।···

আবার যেমন,

দিয়াছিলে যাহা, গিয়াছে ফুরায়ে
ভিখারীর বেশ তাই,
ফুরায় না যাহা এবার সে ধন
তোমার চরণে চাই।···

এইভাবে কোথাও কোথাও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব দেখতে পাই, কিন্তু মোটমাট দেখতে গেলে দুজনের কবিতা একেবারে আলাদা-ধরণের এবং অতুলপ্রসাদের কবিতা-গানের উপরে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব খুব কমই পড়েছিল। অতুলপ্রসাদের জীবনের উপরে কিন্তু গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল সেটা সুস্পষ্ট হয় তাঁর চিঠি থেকে।[১]

---

১. পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

বাসনা ছিল যে কাহাকেও না জানাইয়া হঠাৎ আপনার জন্মদিনের মহোৎসবে উপস্থিত হইয়া আপনার চরণে মাথা ছোঁয়াইব। কিন্তু কর্মের শৃঙ্খলে এমন আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি যে যাইতে পারিলাম না। আমি জানি আজ আপনার উপর অজস্র পত্রবৃষ্টি হইতেছে, তবে ইহাও জানি যে আপনি আমার ধৃষ্টতা মাপ করিবেন, কেন না, এক সময়ে আমি আপনার স্নেহ ও অনুগ্রহের পাত্র ছিলাম। আমি আপনাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিতেছি। বঙ্গ সাহিত্য-তীর্থের

উচ্চাঙ্গ শাস্ত্রসঙ্গীতের আসর ছাড়া অন্য সব আসরেই সেন মশায়কে তাঁর নিজের গান গাইবার জন্য অনুরোধ করা হতো — তিনি সানন্দে গাইতেন। নিজের রচিত গান তাঁর গলায় অতি চমৎকার লাগতো — তিনি সাধারণতঃ খালি গলায় গান গাইতেন — তাঁর গান গাইবার ঢং এমন প্রাণবন্ত ছিল যে বিনা তানেই গানের আপন সত্ত্বা ফুটে উঠতো। তাঁর গানে এখন কোনো গায়ক সুদীর্ঘ তান দিলে আমাদের মতো পুরোণো ব্যক্তিদের কানে বাজে। সেন মশায় নিজের গানকে প্রাণবন্ত করতেন কোনো কোনো কথার উপর জোর দিয়ে, আর ঠিক জায়গায় থেমে — কোথায় কতটা থামলে গানের মর্মকথা পরিস্ফুট হবে, তা তাঁর খুব খেয়াল থাকতো, আর খেয়াল থাকতো, গানের গতি ও বিরতির তারতম্য ওজন করে ব্যবহার করা। এই যতির বিশেষত্ব তিনি গান গাইবার সময় সহজাত করে ফেলেছিলেন। কোথায় কতটুকু বিরতি, কতটুকু গতি, কোথায় হাল্কা টান, কোথায় দীর্ঘ, এসব নিয়ে তিনি সতর্ক থাকতেন এবং চাইতেন অন্যেও সতর্ক থাকুক। এখন অতুলপ্রসাদের গানের আসর দেশে অনেক বেড়ে গেছে — অনেক গায়ক-গায়িকারই সুমিষ্ট স্বর — অনেকে আবার তান লাগান — কারুকার্য যোগ করেন, কিন্তু খুব কম সংখ্যক গায়কগায়িকাই গানের সত্ত্বাকে প্রকাশ করতে পেরেছেন। আজ সেন মশায়ের দেশব্যাপী খ্যাতি, কিন্তু তিনি চলে গেছেন প্রায় চল্লিশবৎসর আগে — তাই বাংলার গায়কদের তাঁর সঙ্গে মেশামেশি করবার সুযোগ বেশী হয়নি। ফলে, তাঁর নিজের গাইবার ঢং অথবা গায়কী বেশী লোকের

সর্বপ্রধান পুরোহিত, ধর্মেসিদ্ধ ও অগ্রণী, সঙ্গীতকুঞ্জের মাধব, বাংলার দুলাল এবং আমার পরম ভক্তিভাজনের চরণে আজ প্রণত হইতেছি। কায়মনোবাক্যে আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি আপনি দীর্ঘায়ু হইয়া দেশের ধর্ম, স্বদেশানুরাগ, সাহিত্য ও সৌজন্যের নেতৃত্ব পদে অধিষ্ঠিত থাকুন।......

কৃপাকাঙ্ক্ষী অতুলপ্রসাদ সেন

কাছে জানা নেই। আমার এক এক সময় মনে হয় অতুলপ্রসাদের কিছু গান মেয়েদের গলায় সুন্দর জমবে বটে, কিন্তু কিছু গান পুরুষদের দ্বারাই ভাল জমতে পারে। আমি ইদানীং দু-তিনজন পুরুষের কণ্ঠে গান শুনে বেশ আনন্দ পেয়েছি, তবু যেন মনে হয় স্রষ্টিকর্তার কণ্ঠে গানের যে-রূপটি ফুটে উঠতো সেরূপ আর কেউ দেখাতে পারছেন না। হয়তো আমি তাঁর কণ্ঠে গান শুনে শুনে একটা সংস্কারের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি, তাই আমি এখন মনে করি, এ হয়তো আমারই অক্ষমতা। তখন সম্ভবতঃ আমরা এক অজানিত বিহ্বলতায় ডুবে থাকতাম — একজন প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার, দু'হাতে রোজগার করছেন — সহরের অনেক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত আছেন — সকলের সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ — গানের আসরে অবারিত দ্বার — অকুণ্ঠ সহৃদয়তা — এ সবের একত্রে অপূর্ব সমাবেশ দেখে! এই অতুলপ্রসাদ যখন প্রাণ খুলে গাইতেন,

মিশ্র আশাবরী

আমার আঙ্গিনায় আজি পাখী
গাহিল এ কি গান!
শুনিনি এমন গাওয়া —
হেন মরম ভেদী বাণ।
যে করেছে অবহেলা, আমার গানের মালা
আজি কি পাখীর গলায়, তার গলার প্রতিদান?……

অথবা যখন গাইতেন, মিশ্র কালাংড়া

বঁধু ধর ধর মালা পর গলে,
ফিরে দিও না বন-কুসুম ব'লে।
কাঁটার ঘায়ে রাঙ্গা হাতে
ফুল তুলেছি, আঁধারে দুঃখ রাতে
তাহে গেঁথেছি বিজনে আঁখিজলে।……

আবার,

গজল

কে গো তুমি বিরহিণী, আমারে সম্ভাষিলে,
এ পোড়া পরান তরে এত ভালবাসিলে ?
কভু হরিত বসনে সাজি
কুসুমে ভরিয়া সাজি
মধুমাসে মধুহাসে মম পানে হাসিলে
কে আমারে সম্ভাষিলে ?······

তখন আমরা দেখেছি, স্থানে স্থানে কি মধুর যতি পড়ত, আর গানটি মূর্ত হয়ে উঠ্‌ত। আবার যখন তিনি টানা সুরের গান গাইতেন —

লউনি

কেন এলে মোর ঘরে আগে নাহি বলিয়া,
এসেছ কি হেথা তুমি পথ তব ভুলিয়া।
তোমার লাগিয়া আজ
পরিনি মিলন সাজ
বিরহ শয়নে ছিনু আঁখি ছলছলিয়া
কে জানিত ছিল মোর দোরখানি খুলিয়া ?······

আবার গাইতেন,

গজল

কত গানত হলো গাওয়া, আর মিছে কেন গাওয়াও ?
যদি দেখা নাহি দিবে, তবে মিছে কেন চাওয়াও ?
যদি যতই মরি ঘুরে,
তুমি ততই রবে দূরে,
তবে কেন বাঁশীর সুরে,
তব তরে শুধু ধাওয়াও ?······

আবার যখন গাইতেন, ভৈরবী

সবারে বাসরে ভাল, নইলে মনের কালো ঘুচবে না রে,
আছে তোর যাহা ভাল, ফুলের মত দে সবারে,
করি তুই আপন আপন হারালি যা ছিল আপন
এবার তোর ভরা আপন বিলিয়ে দে তুই যারে তারে……

তখনও শ্রোতাদের মন ভরে যেতো। তখন পরিষ্কার বুঝতাম ভাষার আবেদন কতটা হতে পারে! ভৈরবী তো কতই শুনি কিন্তু ভাষা (রবীন্দ্রনাথের বিশেষ করে) প্রাণকে কী অপূর্ব দোলা দেয়! এসব গান চোখ বুজে, সমস্ত প্রাণ ঢেলে দিয়ে তিনি গাইতেন। অনেকগুলি গান ছিল সর্বদাই গাইতেন — উপরে উল্লেখ করলাম সেগুলি ঐ গানগুলির মধ্যে। তা ছাড়া কথাবার্তা বলতে বলতে, কত সময়ে কত অন্য গান এসে যেতো। আমি একদিন সেন মশায়কে বলেছিলাম, "আপনার গান শ্রোতার মনে এমন একটা উদাস ভাব সৃষ্টি করে, যেন মনে হয় জীবনটা নিরাশা আর বিষাদ মাখা"। তিনি একটু আহত হলেন আর বললেন, "তোমরা আমার গানে বিষাদই দেখ, আনন্দ দেখ না?" আমি থতমত খেয়ে বললাম, "আনন্দ দেখা যায় কিন্তু সে আনন্দ অতৃপ্ত মনের বেদনায় ভরা — সেই আনন্দময় বেদনাভরা উক্তিতে, ব্যথা ও বিষাদ বেশী চোখে পড়ে — আনন্দটা নিহিত থাকে গভীরে।" বলে বাঁচলাম, — তিনি বললেন, "ভেবে দেখ, জীবনটা কি তাই নয়? যেখানেই দেখছ আনন্দ — তলিয়ে দেখবে সেখান থেকেই পাবে দুঃখ ও ব্যথা — যাক্, তাছাড়া তোমরা আমার সেই গানগুলি কেন বেশী মনে রাখ না, যেগুলিতে মন আনন্দে দোলা দেয় — প্রাণ নেচে ওঠে — সেগুলি খুব হাল্কা গান।" এই বলেই তিনি গুণ্ গুণ্ করে গাইতে লাগলেন — আমার দিকে আর একটু এগিয়ে এসে — পাঁচটি আঙুল একত্র করে, হাতটি আমাদের আরো সামনে এনে,

আমরা নাচি ফুলে ফুলে দুলে দুলে
নাচি সুরধুনি কুলে কুলে······

আবার শোনো,

ওগো আমার নবীন শাথী, ছিলে তুমি কোন্ বিমানে ?
আমার সকল হিয়া মুঞ্জরিছে, তোমার ঐ করুণ গানে,
জগতের গহন বনে
ছিনু আমি সঙ্গোপনে
না জানি কি লয়ে মনে
এলে উড়ে আমার পানে······

আরো শুনবে

জল কহে চল মোর সাথে চল
তোর আঁখিজল
আর ঘুচবে না।
চেয়ে দেখ তোর নীল জলে,
শত আঁখি করে টলমল,
মোরা বাহিরে চঞ্চল, অন্তরে অতল
সে অতলে······

আবার শোনো,

ঝরিছে ঝর ঝর, গরজে গর গর
স্বনিছে সরসর, শ্রাবণ মাঃ
তটিনী তরতর, সরসী ভর ভর
ধরণী থর থর, সিকত গা······

আমরা সকলে যেমন লজ্জিত হলাম আবার তেমনি আনন্দ পেলাম এসব গান তাঁর খুব প্রিয় ছিল — যখনই মনে আনন্দের গুঞ্জরণ উঠতো তখনই তিনি আমাদের কাছে এই সব গান সমস্ত প্রাণ মন দিয়ে গাইতেন। কথাবার্তার মধ্যে, পুরো গানটা খুব কম সময়ই

গাইতেন কারণ তিনি স্বভাবতই স্বল্পভাষী, বিশেষতঃ নিজের রচনা নিয়ে। তিনি অনেক সময়ে আমাদের কাছে প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করতেন যে, এই রকম কিছু গান ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা নেচে নেচে গায়। অতুলপ্রসাদ চাইতেন যে তাঁর গান তাঁর নিজের ঢং-এ গাওয়া হয় — নিশ্চয়ই সব কবিই তাই চান। এটাই স্বাভাবিক, কারণ প্রত্যেক কবিতাই — হরষের হোক অথবা বিষাদের হোক — কবির আনন্দের উৎস থেকেই আসে। ঠিক কবির ঢং আনা সম্ভবপর হতো যদি প্রথম থেকে সে দিকে দৃষ্টি রাখা যেতো। তা হয়নি, কারণ আমরা অথবা কবি নিজে, কখনই ভাবতে পারেননি তিনি এত তাড়াতাড়ি চলে যাবেন। তাছাড়া গানগুলি যে এত জনপ্রিয় হবে তাও আমরা নিশ্চিত ধারণা করতে পারিনি। কবি নিজেও ঠিক বুঝতে পারেননি — তিনি সঙ্গীত-জগতে কি রেখে যাচ্ছেন! আমরা ভাবতাম আমরা নিজেদের গণ্ডীতে তাঁর গানে মশ্‌গুল্‌ হয়ে আছি — হয়তো আমাদের মূল্যায়ণ পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট এবং আমাদের দৃষ্টি সংকীর্ণ ও সীমিত। আমাদের এইভাবের প্রধান কারণ এই যে বঙ্গদেশের বিখ্যাত সাহিত্যিকেরা (সুশীল দে বলুন, মোহিত মজুমদার, যোগেশ বাগল বলুন, এবং অন্যান্যরা) অতুলপ্রসাদের বিষয়ে কিছুই লেখেননি। তাছাড়া, কবির খেয়ালও হয়নি, পছন্দমতো একটি স্বরলিপি রেখে যাওয়া। কবির অনুমোদিত স্বরলিপি[১] কোন্‌টা তা নিয়ে এখন মত-বিরোধ আছে।

১. প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি যে আমি দুবৎসর পূর্বে বিষ্ণুপুর গিয়েছিলাম — আমার প্রবল ইচ্ছা ছিল, বিষ্ণুপুর ঢং-এ উচ্চাঙ্গের গান শুনতে আর মন্দির দেখতে। দেখা করলাম বাড়ী গিয়ে প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে, আর তাঁর কন্যার সঙ্গে। সুরেনবাবু বৃদ্ধ হয়েছেন তবুও তিনি দুতিনখানা বাজনা শোনালেন। আমার অনুরোধে সুরেনবাবু অতুলপ্রসাদের দু'তিনখানা গান শোনালেন — এতদিন পর অতুলপ্রসাদকে খুব কাছে পেলাম। অতুলপ্রসাদের

সাহানা দেবী, দিলীপ রায় খুবই নির্ভরশীল নির্দেশক — দুজনই আপন আপন স্থানে দূরে আছেন -- আমাদের আসরে পাওয়া কঠিন, তা সত্ত্বেও আমি আমার অভিমত এইভাবে ব্যক্ত করতে চাই যে, যতটা সম্ভব কবির গানগুলি তাঁর ঢং-এ গাওয়া উচিত। শুনেছি যাঁরা স্বরলিপি বোঝেন তাঁদের পক্ষে ঢংটা বুঝতে পারা খুব কঠিন নয়। এ বিষয়ে কেবল একটি কথা বলবো — যতটা সম্ভব তাঁর গানে তান একেবারে না লাগানই শ্রেয়ঃ -- যেটুকু তান অঙ্গাঙ্গীভাবে গানের সঙ্গে আছে, সেটুকুতো দিতেই হবে -- হয়তো আর একটু-আধটু আসর গরম করবার জন্য প্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু তানের জন্য তান অতুলপ্রসাদের কাণে পৌঁছালে তিনি স্বর্গে অস্বস্তি বোধ করবেন। তাঁর গান যখন হয় তখন কেবল আমরা উদগ্রীব হয়ে শুনতে চাই প্রাণের সাদা কথা সুরের ঐক্যে, কি অপরূপভাবে আমাদের মনকে সিক্ত করবে

দরদীকবি অতুলপ্রসাদ

অনেকে মনে করেন অতুলপ্রসাদ তাঁর কবিতায় ও গানে নিজের জীবন প্রকাশ করেছেন। কবির কাব্যকে আমি এভাবে দেখি না — এভাব আমার কাছে ভ্রান্তভাব — কবির মর্যাদা এতে ক্ষুণ্ণ হয়। অতুলপ্রসাদ যদি তাই লিখে থাকেন তবে আমি তাঁকে 'কবি' আখ্যা দিতে নারাজ। কবি কেবল স্রষ্টা নন, তিনি দ্রষ্টাও। যে কবিতা লেখে তাকেই 'কবি' আখ্যা দেওয়া যায় না। যে কবি অন্যের জীবনের সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশা দেখে নিজের মধ্যে অনুভব করে, তারপর

অনেকগুলি গানের স্বরলিপি তিনি সেন মশায়কে প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন এবং তার জন্য তিনি পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন।

কবিতায় ও গানে রূপ দেয় — অন্যের দুঃখ ও আনন্দ নিজের মধ্যে গভীরভাবে অনুভব করে বলেই সে 'কবি' আখ্যা পায়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

তোমাদের চোখে আঁখিজল ঝরে যবে
আমি তাহাদের গেঁথে দিই গীত রবে
লাজুক হৃদয় যে কথাটি নাহি কবে
সুরের ভিতরে লুকাইয়া কহি তাহারে,
নাহি জানি আমি কি পাখা লইয়া উড়ি
খেলাই, ভুলাই, দুলাই, ফুটাই কুঁড়ি
সন্ধান তার বলিতে পারি না কাহারে।

এইখানেই কবি দ্রষ্টা ও স্রষ্টা — এইখানেই কবি দরদী। আপন দুঃখ সে প্রকাশ করে না — ততটুকুই প্রকাশ পায়, যতটুকু অন্যের ব্যথার সঙ্গে মিশে, বিশ্বের ব্যথায় পরিণত হয় — অথবা অন্যের আনন্দের সঙ্গে মিশে, বিশ্বের আনন্দে পরিণত হয়। কবি নিজের দুঃখ জানায় না, তাই তাকে চেনা যায় না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন —

যে আমি স্বপন মুরতি গোপনচারী
যে আমি আমারে বুঝিতে বুঝাতে নারি,
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি
সেই আমি কবি। কে পারে আমাকে ধরিতে ?
মানুষ আকারে বদ্ধ যে জন ঘরে
ভূমিতে লুটায় প্রতি নিমেষের ভরে
যাহারে কাঁপায় স্তুতি নিন্দার জ্বরে
কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে।

অতুলপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও অন্যান্য

বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে অতুলপ্রসাদ কলকাতায় এসে আইন-ব্যবসা আরম্ভ করলেন — আর একদিকে, সাহিত্য-আলোচনা ও সঙ্গীতচর্চা চলছিল প্রায় বিকেলেই। খামখেয়ালী ক্লাব[১] ও মণ্ডে ক্লাব ভালই জমে উঠেছিল। ক্রমে যখন বুঝতে পারা গেল যে এভাবে চললে ভবিষ্যৎ সন্দেহজনক, অন্যদিকে তাঁর উপর বিবাহের চাপ পড়লো, তখন বিবাহ আইনসিদ্ধ করবার জন্য তিনি দ্বিতীয়বার বিলাত চলে গেলেন। বিলাত থেকে ১৯০২ সনে ফিরে আসার পর তিনি লখনৌতে কাজ

১. অতুলপ্রসাদের লেখাতে পাই, "খামখেয়ালী দলে ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, মহারাজা জগদিন্দ্র রায়, বলেন্দ্র ঠাকুর, জ্ঞানেন্দ্র ঠাকুর, অবনীন্দ্র ঠাকুর, লোকেন্দ্র পালিত প্রমুখ অনেক সাহিত্যিক ও সুরসিক।......এ খামখেয়ালী মজলিশকে মশগুল রাখতেন পরম হাস্যরসিক দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তিনি আমাদিগকে হাসির বন্যায় ভাসাইতেন তাঁহার হাসির গান গাহিয়া। আমরা সকলে তাঁর হাসির গানের কোরাসে যোগ দিতাম। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কোরাসের নেতা। সকলের মুখে হাসি, কণ্ঠে গান, হাসির উচ্চরোলে সভাস্থল কম্পান্বিত হইত। দ্বিজেন্দ্রলাল গাহিতেন — "হতে পাত্তেম আমি একজন মস্ত বড় বীর"— আর রবীন্দ্রনাথ মাথা নাড়িয়া কোরাস ধরিতেন — "তা বটেই-ত, তা বটেই-ত।" দ্বিজেন্দ্রলাল গাহিতেন — "নন্দলাল একদা একটা করিল ভীষণ পণ", রবীন্দ্রনাথ গাহিতেন "বাহারে নন্দ বাহারে নন্দলাল।" দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের নাচাইতেন হাসির উদ্বেল তরঙ্গে, রবীন্দ্রনাথ আমাদের মুগ্ধ করিতেন তাঁর অনুপম সূক্ষ্ম হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়া। খামখেয়ালীর আসরে বিখ্যাত গায়ক রাধিকা গোস্বামী তাঁর উচ্চাঙ্গের তানলয়মণ্ডিত গান গাহিয়া...গোস্বামীর উপাদেয় সুরে রবীন্দ্রনাথ গান বাঁধিতেন "মহারাজ একি সাজে এলে হৃদয়পুর মাঝে, চরণ তলে কোটী শশী সূর্য মরে লাজে......।" খামখেয়ালীর মজলিশে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অধিকারী —।"

শুরু করলেন — এবার কিন্তু মনে প্রাণে কাজ আরম্ভ করলেন — সঙ্গীতকে প্রায় বর্জন করেই। মাঝে মাঝে যখন আদালত বন্ধ থাকতো তখন কলকাতায় যেতেন। কলকাতায় গেলে কখনো সেখানেই, কখনো শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। অনেকেই জানেন ১৯১৪ সনে অতুলপ্রসাদকে কয়েকদিনের জন্য রামগড়ে এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে থাকতে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল এবং তিনি রামগড়ে কবির আর দিনুবাবুর সান্নিধ্য পেয়ে কী যে আনন্দ উপভোগ করে-ছিলেন তা বর্ণনাতীত! কবিগুরু অতি প্রত্যুষে উঠে একান্তে বসে প্রকৃতির বিরাটত্ব ও মাধুর্য উপভোগ করতেন আর কবিতা ও গানের প্রেরণা পেতেন। সে সব বিবরণ মাসিক পত্রে লেখা হয়েছে — অনেকেই পড়েছেন অথবা জানেন। যখন দ্বিজেন্দ্রলাল আসরে থাকতেন, হাসির গান বেশী পরিমাণে হতো — রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, নাটোরের জগদিন্দ্রনাথ প্রভৃতিরা সকলেই একত্র হয়ে আনন্দোচ্ছ্বাসে সভা মুখরিত করে তুলতেন। সে সময় প্রায়ই জগদিন্দ্রনাথ গানের সঙ্গে পাখোয়াজ বাজিয়েছেন, এমন কি তিনি কখনও কখনও রবীন্দ্রনাথের আবৃত্তির সঙ্গেও পাখোয়াজ বাজিয়েছেন।

১৯২৯ সালে[১] রবীন্দ্রনাথ একবার লখনৌতে দু-একদিনের জন্য এসেছিলেন আমেদাবাদ যাবার রাস্তায়। স্টেশনে যখন আমরা রবীন্দ্রনাথকে উঠিয়ে দিতে এসেছি এবং রবীন্দ্রনাথ গাড়ীর প্রকোষ্ঠে বসেছেন তখন তিনি বলে উঠলেন, "অতুল, তখনকার মজলিশ মনে পড়ে? আমার কবিতা আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্র পাখোয়াজে প্রতিধ্বনি সুরু করে দিতেন? "বর্ষামঙ্গল" যেই আরম্ভ করতুম —

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জল-সিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে

---

১. এইবারই আমরা কবির সঙ্গে অসিত হালদারের বাড়ীতে চা খেলাম।

ঘন গৌরবে নব যৌবনা বরষা
শ্যাম গম্ভীর সরসা।
গুরু গর্জনে নীল অরণ্যে শিহরে
উতলা কলাপী কেকা কলরবে বিহরে
নিখিল চিত্ত হরষা
ঘন গৌরবে আসিছে মত্ত বরষা……"

অতুলপ্রসাদকে লক্ষ্য করে কবির রোমাঞ্চকর আবৃত্তি স্টেশনে দাঁড়িয়ে শুনে নিলাম। আর একবার অতুলপ্রসাদ ছুটির মধ্যে কলকাতায় এসে রবীন্দ্রনাথকে ফেডারেশন স্ট্রীটে আপন বোন্ কিরণ বসুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সেখানে এই প্রথম রবীন্দ্রনাথকে এত কাছে পেলাম — যেখানে ছিলেন স্যর নীলরতন সরকার, ডঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য এবং আরও কিছু গণ্যমান্য লোক। নীলরতন সরকারের অনুরোধে, রবীন্দ্রনাথ "দেবতার গ্রাস" আবৃত্তি করলেন — সে রোমাঞ্চকর উত্তেজনার বিষাদময় চিত্র সকল শ্রোতাকে বেশ কিছুক্ষণের জন্য অভিভূত ও স্তিমিত করে রেখেছিল। রবীন্দ্রনাথ এই আবৃত্তিটি এত উচ্চৈঃস্বরে করতেন এবং এত উত্তেজিত হতেন যে পরে কিছুক্ষণ পরিশ্রান্তবোধ করতেন আর মনের উপরে প্রবল চাপ বোধ করতেন। এইজন্য তিনি এটা আবৃত্তি করতে বার বার অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু শেষে তিনি শোনালেন।

এই কিছুদিন পূর্বে আমি ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে, অতুলপ্রসাদের কথা উঠলো। তিনি বললেন নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ খুবই সৌখিন ছিলেন — প্রায়ই সঙ্গীতের আসর বসতো — অনেক বড় বড় গুণীদের আগমন হতো — অনেক রসিক শ্রোতারা উপস্থিত থাকতেন যেমন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, লোকেন পালিত, যতীন বাগ্‌চি, অতুলপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি। সেই আসরে অতুলপ্রসাদের সঙ্গে ডঃ মজুমদারের

পরিচয় হয়। মজুমদার মশায় বললেন — একদিন সেই বাড়ীতে বড় এক ওস্তাদের গান হলো — সকলেই বাহবা দিলেন। জগদিন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদকে বললেন "আজকের গান কেমন লাগলো?" অতুলপ্রসাদ বললেন, "গান? কই গান ত শুনিনি।" জগদিন্দ্রনাথ বললেন, "কেন, এই যে দেড় ঘণ্টা এতগুলি গান হলো, শুনলে না?" অতুলপ্রসাদ বললেন, "এগুলি ত গান নয়, সুরের লড়াই — গান বলে ত হৃদয়ে কিছু সাড়া পেলাম না।" মজুমদার মশায় আমাকে বললেন অতুলপ্রসাদ যে রসিক তা সেদিন বুঝলাম।

অতুলপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ, দিলীপ রায় ও অন্যান্য

কলকাতার খামখেয়ালী ক্লাব আর মণ্ডে ক্লাবের[১] দিন চলে গেছে। অতুলপ্রসাদ এখন প্রৌঢ় — সতেরো-আঠারো বৎসরে লখনৌতে প্র্যাকটিস্ বেশ জমেছে। কলকাতা থেকে আপন আত্মীয় বন্ধুবান্ধব, রাজনীতিক্ষেত্রের বন্ধুবান্ধব সর্বদা আসা-যাওয়া করে। দিলীপ রায় বিলাত থেকে ফিরে এসেছেন — লখনৌতে এলেন — সঙ্গীতাদি হয়েছিল — ধূর্জটিপ্রসাদ তো সর্বদাই থাকতেন। আদালত ছুটি হলে অথবা অন্য ছুটিতে অতুলপ্রসাদ কলকাতায় আসতেন এবং অনেকটা সময় জোড়াসাঁকোতে কাটাতেন। রবীন্দ্রনাথ একবার লখনৌ এসেছিলেন ১৯২৩ সালে লখনৌতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক সমাবর্তনে অভিভাষণ দিতে। আমি তখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে বহাল হইনি। লখনৌতে পরে এসে শুনলাম, কবিকে খুব আন্তরিকতার সঙ্গে

১. এই ক্লাবের মেম্বর ছিলেন অনেক সাহিত্যিক, যেমন সুকুমার রায়, অমল হোম, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, অজিত চক্রবর্তী, সত্যেন দত্ত আর অন্যান্যরা যেমন শিশির দত্ত, দ্বিজেন মৈত্র, কালিদাস নাগ, প্রশান্ত মহলানবীশ ইত্যাদি।

সম্বর্দ্ধনা করা হয়েছিল। অতুলপ্রসাদ প্রচুর আতিথেয়তা দেখিয়েছিলেন এবং কবির আগমন লখনৌ শহরে বাঙালীদের পক্ষে চিরস্মরণীয় থাকবে। ১৯২৬ সালের আরম্ভে যখন রবীন্দ্রনাথ লখনৌ এলেন অখিলভারত সঙ্গীত সম্মেলনের নিমন্ত্রণ পেয়ে তখন তার সঙ্গে প্রদর্শনীর জন্য কবির চিত্রাঙ্কন আনান হয়েছিল। তখন কবির সঙ্গে ছিলেন শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ, শিল্পাচার্য নন্দলাল প্রভৃতিরা। কবি এবং তাঁর সঙ্গীরা এসে গোমতী নদীর ধারে "বলরামপুর হাউসে" অতিথি হয়ে ছিলেন। দ্বিতীয় দিনই তাঁকে হঠাৎ ফিরে কলকাতায় চলে যেতে হলো কারণ টেলিগ্রাম এলো কবির জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের মৃত্যুসংবাদ। ফলে, আমাদের যে সব সাহিত্যবৈঠক, চা পার্টি, গানের মজলিশের বন্দোবস্ত হয়েছিল সবই একরকম শ্রীহীন হয়ে গেল; যাঁরা রইলেন তাঁদের নিয়ে সঙ্গীত আসর অতুলপ্রসাদের বাড়ীতে বসেছিল। এ সব আসরে ছিলেন আমাদের সমস্ত সঙ্গীত রসিক বন্ধুরা, বিশেষ করে দিলীপ রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ, সাহানা দেবী, চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত ইত্যাদি। দিলীপ রায় গিরীশ ঘোষের সেই গান "রাঙ্গা জবা ..." দিয়ে শ্রোতাদের পরিপূর্ণভাবে মনোরঞ্জন করলেন — আরও কতরকমের গান রবীন্দ্র-সঙ্গীত ও অতুলসঙ্গীত গাইলেন সাহানা দেবী ও চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত। পাঁচ-ছ'দিন খুব আনন্দের সঙ্গে কেটে গেল।

যখন অতুলপ্রসাদ কলকাতায় যেতেন তখন সঙ্গী পেলে শান্তিনিকেতনে কবির কাছে কয়েকটা দিন কাটাতেন। শান্তিনিকেতনে আসবার সময় বেশীর ভাগ সময়ে সঙ্গী হতেন দিলীপ রায়। বোধহয় ১৯২৮ পর্যন্ত দিলীপ রায় পণ্ডিচেরীর বাইরেই ছিলেন, সুতরাং তিনি মধ্যে মধ্যে শান্তিনিকেতনে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতেন। ১৯২৬-এর শেষাশেষিতে অতুলপ্রসাদ এবং দিলীপ রায় তিন দিনের জন্য শান্তিনিকেতনে কবির অতিথি হয়ে ছিলেন। তখন কবির সঙ্গে অবিশ্রান্ত

আলাপ আলোচনা ও গান হতো। অতুলপ্রসাদের সান্নিধ্যে কবি অতিশয় আনন্দ উপভোগ করতেন। কবি সমস্ত প্রাণ খুলে কথাবার্তা বলতেন অতুলপ্রসাদকে উদ্দেশ্যে করে আর, স্নেহের সুরে বলতেন দিলীপ রায়কে উদ্দেশ্য করে। অনেক সময় এমন এমন কথা বলতেন যার থেকে রবীন্দ্রনাথের জীবনের অথবা মনের একটা প্রকোষ্ঠ আমাদের কাছে খুলে যেতো এবং যার থেকে অনেকেরই পক্ষে অজানা তথ্য প্রথম আলোক পেতো। দিলীপ রায়ের বইতে পাই, অতুলপ্রসাদকে উদ্দেশ্য করে রবীন্দ্রনাথ আত্মপ্রকাশ করছেন এই বলে —

আমার "ছিন্নপত্রে" কিছু ফুটেছে আমি প্রকৃতিকে কী গভীরভাবে ভালবাসতে শিখেছিলাম অল্প বয়সেই। বেশ মনে আছে দিনের পর দিন নিরাভরণাকে কাছে পেতাম, খোলা আকাশের নীচে উদার মাঠে বালুচরে, আর মনের কানায় কানায় ভরে উঠতো নিটোল তৃপ্তি। কিন্তু প্রতি লাভের উল্টাপিঠে কিছু-না-কিছু হারাতেই হয়, তাই একলা প্রকৃতির সঙ্গে দহরম মহরম করতে করতে মানুষের সঙ্গে কোলাকুলি, গলাগলি, মাখামাখি করার শক্তির আমার বিকাশ হয়নি তেমন। সব কিছুর মতো মেলামেশার কৌশলটিও বহু চর্চার ফলেই আয়ত্ব হয়। আমার হয়নি চর্চার অভাবে। তাই লোকে অনেক সময়েই ভাবে আমি মানুষকে সত্যি স্নেহ করতে পারি নে। কিন্তু দুঃখের কথা বলব কি, অতুল, যারা আমার এ বদনাম রটায় তারাই আবার শুধু যে পদেপদেই আমার উপর চড়াও হয় তাই নয় — আমার অবসরকে শতছিদ্র করে দিতে একটুও সংকুচিত হয় না। আমি চেষ্টা করি তাদের নানা দাবী মেটাতে। কিন্তু ঐ যে বললাম চট্ করে এর-ওর-অন্তরঙ্গ হয়ে উঠবার একান্ত অক্ষমতার দরুণ পারি নে। অমনি তারা মুখ ভার করে বলে — আমি মিশতে পারি নে — কিন্তু এ কথা সত্য নয়। আমি শুধু প্রকৃতিকেই নয় — মানুষকেও সত্যিই ভালবেসেছি। কিন্তু হলে হবে কি, ঠিক্ পদ্ধতিটি শিখিনি

তাদের মন পাওয়ার। তবু বলবো, আমি সত্যিই প্রাণপণ চেষ্টা করি কাউকেই খালি হাতে ফিরিয়ে না দিতে। কিন্তু দেখি — যতই দেই ততই তারা চায়, আর যা পেলো তার হিসাব ভুলে, ঠিক্ তত জোড়ে কী পেলো না তাই বলে। অথচ মজা এই যে যারা ভারিক্কী চালে চলে, তারা পায় অজস্র সাধুবাদ। একটা দৃষ্টান্ত দিই। বঙ্কিমচন্দ্রকে আমার একটু কাছ থেকে দেখবার সুযোগ হয়েছিল। তিনি ছিলেন রাশভারী লোক। এখানকার মতো তাঁর দ্বার অবারিত ছিল না সর্ব-সাধারণের জন্য। আর আমি যা পারি বহু কষ্টে — তিনি পারতেন সহজেই — অর্থাৎ লোককে "না" বলতে। ফলে হলো এক আশ্চর্য ব্যাপার। লোকে একবাক্যে বলা শুরু করলো, আহা, বঙ্কিমবাবু কী অমায়িক মানুষ। তার কাছে ঘেঁষবার শক্তি ছিল খুব কম লোকেরই, আর যারা ঘেঁষতো একটু কাছে, তারাও বেশী এগুতে ভয় পেত। তাই তাঁর কাছ থেকে হৃদ্যতার ছিটেফোঁটা পেলেও লোকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতো। কিন্তু আমার ঘরে যে-কেউ যখন-তখন কাদা পায়ে এসে জাজিমের উপর জেঁকে বসে আমাকে আপ্যায়িত করার পরে ফিরে গিয়ে অম্লানবদনে বলে, আমি মিশতে জানি নে। আমি তাই একটি ছড়ায় একবার লিখেছিলাম,

নাহি চাহিতেই ঘোড়া দেয় যেই
ফুঁকে দেয় ঝুলি থলি
লোকে তারপরে ভারি রাগ করে
হাতি দেয় নাই বলি।
বহু সাধনায় যার কাছে পায় —
কালো বেড়ালের ছানা
লোকে তারে বলে নয়নের জলে
দাতা বটে ষোলো আনা।"

খল প্রকৃতি তাদেরই যারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কুণ্ঠিত হয়ে অসত্যের

আশ্রয় নেয় -- উল্টে বিক্ষোভ জারী করে। মানুষের এই ঘৃণিত খল স্বভাবকে রবীন্দ্রনাথ হাস্যরসের কবিতা ও কথায় নির্মমভাবে অনাবৃত করে সেদিন অতুলপ্রসাদের সম্মুখে ধরলেন — জানেন তিনি কবি হিসেবে নিকট আত্মীয়, রসগ্রাহী এবং তিনি বুঝবেন, কেন কবি ক্ষুব্ধ। এ সব কথা কবি অতুলপ্রসাদকেই মাত্র বলতে পারতেন — সাতষট্টি বছরের কবি সাতান্ন বছরের অতুলপ্রসাদকেই মাত্র এত খোলাখুলিভাবে বলতে পারেন — বিশেষ করে বঙ্কিমের মতো এত বড় সাহিত্যিকের নাম উল্লেখ করে — একত্রিশ বছরের দিলীপ রায়ের সঙ্গে এ সব রসিকতা হয়তো শোভন না হতে পারে। অন্যদিকে আমরা দিলীপ রায়ের কাছে কৃতজ্ঞ যে, তিনি সত্যসন্ধানী হয়ে — অপ্রিয় ও নিষ্ঠুর কথা "রবীন্দ্রনাথ স্নেহশীল নন", "তিনি হৃদয় থেকে বলেন না, মন থেকে বলেন" নির্মমভাবে কবিকে বলে বসলেন, — দিলীপবাবু এই অভিযোগ একজন ভাল লোকের মুখে শুনেও, নির্বিকারে মেনে নেননি, বরং বিনা দ্বিধায় অভিযোগ পেশ করলেন কবির মতো লোকের সম্মুখে — সত্যতা যাচাই করবার উদ্দেশ্যে — যাতে কবির মুখের উক্তিতে এই মিথ্যা লাঞ্ছিত হয়। আমিও কবির বিরুদ্ধে অনেক রকম মনগড়া কথা শুনেছি — যাঁরা কখনো তাঁর সঙ্গে আলাপ করবারও সুযোগ পাননি — যাঁরা তাঁর সাহিত্যের সঙ্গে কখনো যোগও রাখেননি এবং যাঁরা আত্মীয় হয়েও ঈর্ষান্বিত। সর্বদাই আমার প্রবল ইচ্ছা হয়েছে, এ সব বিরুদ্ধবাদীদের কথার সত্যতা কতখানি তা যাচাই করতে, কারণ একসময়ে বেশীর ভাগ লোকই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা ও প্রতিষ্ঠা প্রীতির চক্ষে দেখতে পারতেন না। এইজন্যই দিলীপবাবু আমাদের প্রতি একটা অসাধারণ উপকার করেছেন এমন সুযোগ দিয়ে, যখন রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদকে সম্মুখে পেয়ে লোকের মিথ্যাচরণের মুখোস খুলে দিলেন। এ সম্পর্কে আমাদের কলেজ-জীবনের কথা মনে পড়ে। তখন আমাদের মধ্যে একদল রবীন্দ্রনাথকে

খুব নিন্দা করতো এই বলে যে, তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের প্রতিভা সহ্য করতে পারতেন না — ফলে, চিরকালের জন্য দুজনের মধ্যে মনোমালিন্য হয়ে গেল। আজ দিলীপবাবুর বই থেকে এই প্রথম জানলাম যে, দিলীপবাবু সোজাসুজি কবিকে প্রশ্ন করেছিলেন — "শরৎদা যখন আমাকে বলেন যে আপনি আপনার অনুরাগীদের উস্কে দেন নি পিতৃদেবকে আক্রমণ করতে, তখন আমি বিশ্বাস করি নি। আজ আমার বিশ্বাস হলো প্রথম আপনাকে দেখে……"। দিলীপের এত খোলা পরিষ্কার মন দেখে কবি খুব খুশী হয়েই বললেন —

"তোমার পিতৃদেবকে আমি অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করতাম ও তাঁর প্রতিভার অনুরাগী ছিলাম বলেই তাঁর আক্রমণে দুঃখ পেয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখকে আমি ভয় করি না, ভয় করি ক্ষোভকে। আমি জীবন থেকে এই মস্ত শিক্ষাটি চয়ন করেছি যে, যা বাইরের তাকে বাইরে রেখে দিলেই তা থেকে লাভ করা যায় ……।" রবীন্দ্রনাথের কথাটি অতি চমৎকার। তাই আমি মনে করি, এ কি কম সত্য আবিষ্কার? আমরা ঋণী তাঁদের কাছে যাঁরা সত্যের অনুসন্ধানী — যাচাই করবার জন্য এক মহৎ ব্যক্তির সম্মুখে নিজের প্রাণের ব্যথা অকপটে প্রকাশ করলেন। তাইতো রবীন্দ্রনাথ সুযোগ পেলেন বলতে যে, সাধারণত দেখা যায়, মানুষ কেবল অকৃতজ্ঞ নয় — অসত্য দিয়ে কৃতজ্ঞতার অভাব ঢাকতেও চায়। বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে বুঝেছিলেন, কার নামের ইঙ্গিত দিলীপবাবু করেছিলেন।

দিলীপ রায়ের লেখা থেকে আরও পাই, কবি রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে অতুলপ্রসাদ কি অনুভব করতেন এবং সে অনুভূতি তিনি কি ভাবে প্রকাশ করেছেন। ১৯২৬-এর শেষাশেষিতে দিলীপ রায় এবং অতুলপ্রসাদ কবির সঙ্গে তিন দিন কাটিয়েছিলেন এবং অতুলপ্রসাদ দিলীপ রায়কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন —

"কবি কেমন অনায়াসে আমাদের মনের তারকে উঁচুনিচু সুরে

বাঁধতে পাবেন, দেখেছ, দিলীপ! তরল থেকে গম্ভীর, গম্ভীর থেকে করুণ, করুণ থেকে উদাস — কবিত্ব থেকে গবেষণা, গবেষণা থেকে সমালোচনা —কোন্ রসটি না ফোটাতে পারেন তিনি? কেবল দুঃখ এই যে আমাদের মনের তার যে-উঁচু পর্দায় তিনি এত সহজে বাঁধেন তাঁর কথার মোচড়ে, সে-উঁচু পর্দা ঢিলে হয়ে যায় তার কাছ থেকে আসতে-না-আসতেই — তখন আমরা পড়ি, আবার যে তিমিরে সেই তিমিরে।"

এই সব আলোচনার পর অতুলপ্রসাদ কবি-স্তব গাইলেন —

জয়তু জয়তু জয়তু, কবি,
জয়তু পূরব উজল রবি···

এবং ঘরখানা শ্রদ্ধায় ভরে গেল। আবার দিলীপ রায়ের লেখাতে আমরা পাই, "সেদিন ছিলাম আমি ও অতুলদা। অতুলদা কবির কাছে গেয়েছিলেন তাঁর বিখ্যাত বাউল গান, "আমার এ আঁধারে এমন করে চালায় যে গো।" কবি তাঁকে বললেন অতুলপ্রসাদের নিয়তিবাদ-এর উত্তরে, "আমি ঠিক্ ও-ধরনের অদৃষ্ট মানি না। আমি মানি যে আমাদের স্বাধীনতা আছে ভাল বা মন্দ করবার। অথচ তবু একটা হাত — অদৃশ্য বিধান — আমাদেরকে চালায়···একটা উপমা আমার মনে হয় এ সম্বন্ধে। ধর একজন বাঁশিওয়ালা রকমারি বাঁশি বানিয়েছেন। প্রতি বাঁশিই আলাদা আলাদা রকম বাজে। কিন্তু দু-একটা বাঁশি যায় — উৎরে — কি করে যেন সব হয়েছে মাপসই — তার ফুটো ঠিক্ পরিসর, কাঠ ঠিক মাপের, আয়তন যেমনটি হওয়া চাই — সব মিলে গেছে। বাঁশিওয়ালা অন্যসব বাঁশিও বাজায় কিন্তু এই উৎরে যাওয়া বাঁশী কয়টি বাজাতেই তার বেশী ভাল লাগে। মানুষের বেলাও ঐ কথা। প্রতি মানুষকেই বিধাতা আলাদা রূপে গড়েছেন, আলাদা আলাদা অভিজ্ঞতার ছাঁচে ঢালাই করে। কিন্তু

কয়েকটা আবার বেশী উৎরে গেল। এদের চরিত্র একটু অভিনিবেশ দিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে তাদের অভিজ্ঞতার গঠন, প্রকৃতি, গুণ-সমাবেশ ঘটনার যোগাযোগ সবেরই পিছনে যেন রয়েছে একজন অদৃশ্য কারিগরের — কি বলবো — design — মৎলব।"

অতুলপ্রসাদ ও তাঁর ধর্ম বিশ্বাস

মহর্ষির তত্ত্বাবধানে আদি ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত অনুষ্ঠানাদি কর্ম কেশব আচার্যরূপে সম্পাদন করতেন। কয়েক বৎসর পর কেশব একটা নূতন আদর্শ পেলেন। এইখানে মহর্ষি-থেকে তিনি আলাদা হয়ে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করলেন। কিছুদিন পরই — কেশব ঢাকা ও বরিশাল প্রভৃতি স্থানে গিয়ে তাঁর নূতন আদর্শ ও নীতি প্রচার করলেন। তখন রামপ্রসাদ সেন এই নূতন আদর্শ নিয়ে, ঢাকার বিখ্যাত জনসেবক বঙ্গচন্দ্র রায়ের সঙ্গে যোগ দিয়ে বিপুল উৎসাহে সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। রামপ্রসাদের মৃত্যুর প্রায় আট বৎসর পর যখন অতুলপ্রসাদ ইংলণ্ড যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন, তখন তিনি নববিধানের ভক্ত প্রচারক মৌলবী[১] গিরীশচন্দ্র সেন মহাশয়ের

১. গিরীশচন্দ্র সেন "মৌলবী" আখ্যা পেয়েছিলেন এইজন্য যে, তিনিই মূল আরবী ভাষা থেকে কোরান অনুবাদ করলেন। বাংলা ভাষায় এই প্রথম কোরান। ব্রহ্মানন্দের খ্যাতনামা শিষ্যেরা প্রৌঢ় বয়সে অসাধারণ অধ্যবসায়ের সঙ্গে নানা দিকে তাদের চিন্তাশক্তিকে ব্যাপৃত করেছিলেন — ফলে কয়েকখানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনাদ্বারা প্রভূত উপকার সাধিত হয়েছে। কেশবচন্দ্র অন্যান্য সাধুসঙ্গীদের উপর অধ্যেতার কার্য ন্যস্ত করেছিলেন: অঘোরনাথকে বৌদ্ধধর্মের, গৌরগোবিন্দকে হিন্দুধর্মের, প্রতাপচন্দ্রকে খৃষ্টধর্মের। তাঁদের আর এক সাধুসঙ্গী সঙ্গীতাচার্য ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল (চিরঞ্জীব শর্মা নামে খ্যাত) নববিধানের

কাছ থেকে উপাসনান্তে বিদায় ও আশীর্বাদ নিয়েছিলেন। তৎকালীন "ধর্মতত্ত্ব" পত্রিকায় ১৮৯২ সনের এক সংখ্যায় আমরা মৌলবী গিরীশচন্দ্র সেনের ভাষণ দেখতে পাই যাতে তিনি অতুলপ্রসাদের বিলাত যাবার সময় একটি নাতিদীর্ঘ উপদেশ দেন (যা-থেকে ছোট্ট একটি অংশ নিচে উদ্ধৃত করলাম) এবং তাঁর পিতা রামপ্রসাদ সেনের ধর্মভাবের বিষয়ও উল্লেখ করেন। পত্রিকাতে প্রকাশ : "বিগত ১৮ই ভাদ্র পূর্ববঙ্গনিবাসী ব্রাহ্ম যুবক প্রীতিভাজন শ্রীমান অতুলপ্রসাদ সেন বিদ্যাশিক্ষার্থে স্বীয় মাতুলদিগের সাহায্যে তাহাদের কর্তৃক ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছেন। তাহাকে বিদায় দান উপলক্ষে ১৭ই ভাদ্র প্রাতঃকালে আমাদের প্রচার কার্যালয়ে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। বহু সংখ্যক ব্রাহ্ম যুবক ও বালক সেই উপাসনায় যোগদান করিয়াছিল। আরাধনান্তে ভাই গিরীশচন্দ্র সেন শ্রীমান অতুলপ্রসাদকে উপদেশ স্বরূপ বলিয়াছিলেন —

"প্রিয়তম অতুলপ্রসাদ, তুমি দীর্ঘকালের জন্য প্রিয় মাতৃভূমি পরিত্যাগ করিয়া নিঃসহায়রূপে অপরিচিত দূরতম প্রদেশের জন্য যাত্রা করিতেছ — এই সময়ে আমি হৃদয়ের কয়েকটি কথা ভগবানের ইঙ্গিতে তোমার মঙ্গলের জন্য তোমাকে বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আশা করি তুমি তাহা বিস্মৃত হইবে না এবং তাহা পালন করিতে উপেক্ষা করিবেন না। বাল্যকালে তুমি পিতৃহীন হইয়াছ এবং এখন বলা যায় তুমি মাতৃহীন। কিন্তু একজন পিতামাতা সর্বদা সহায় ও আশ্রয়রূপে তোমার সঙ্গে আছেন········তোমার পিতা একজন বিধানবিশ্বাসী, বিধানানুগত লোক ছিলেন। আমি প্রায়ই সামাজিক উপাসনান্তে দেখিয়াছি যে তিনি তোমাকে পার্শ্বে বসাইয়া প্রেমে বিগলিত হইয়া ভগবানের পূজা করিতেছেন। এ সকল স্মরণ করিয়ো।

বাণী কথায় কথায় নূতন গান গেয়ে শোনাতেন। ইনিই শ্মশানে রামকৃষ্ণের চিতার পদপ্রান্তে বসে নূতন গানে শেষ পূজা করলেন।

……তৎপর ভাই গিরীশচন্দ্র সেন অতুলপ্রসাদের কণ্ঠে ফুলের মালা পরাইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন।"

অতুলপ্রসাদের মাতুলরা (কে. জি. গুপ্ত, প্যারী গুপ্ত প্রভৃতিরা) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বলেই শুনেছি।[১] কিন্তু তাঁর মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্ত কেশবের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। এটাও জানি, এই পরিবারের অনেকেরই কেশবের প্রতি একটা প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। এ সত্ত্বেও তিনি যে কেন নববিধান ছাড়লেন তার উল্লেখ পাইনি। কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের ভাষণ থেকে উদ্ধৃত করলে দেখা যাবে যে, যখন তিনি রামমোহন লাইব্রেরীতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করেন তখন তিনি কেশবের প্রতি কতটা শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন করেছিলেন —

"Keshab had brought with him a number of devoted followers and under Maharshi's wise and sympathetic guidance and Brahmananda's bold leadership, the movement spread in all directions. The banner of the new faith was carried aloft with fiery zeal by young apostles who had given up all earthly ambitions........caste must be proscribed, intermarriage must be practised and woman must be educated and brought out to the light of the day……"

এই কথাগুলি থেকে পরিষ্কার দেখা যায়, নববিধানের আদর্শে ও কর্মে তাঁর কি রকম আস্থা জন্মেছিল অথচ পরিণত বয়সে অতুল-

১. ১৮৬৯ সনে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দির কেশব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হলো— সেদিন কয়েক জনের মধ্যে ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, কৃষ্ণবিহারী সেন প্রভৃতিরা। আবার কয়েকদিন পর কেশবচন্দ্র ঢাকায় গিয়ে কয়েকজনকে দীক্ষা দিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন বঙ্গচন্দ্র রায় ও কালীনারায়ণ গুপ্ত।

প্রসাদের মাতামহ নববিধান ছেড়ে সাধারণ সমাজ গ্রহণ করেছিলেন। অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে যে, অতুলপ্রসাদও পরিণত বয়সে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বেশ শ্রদ্ধাবান হয়েছিলেন — এই ইঙ্গিত আমরা পাই তাঁর দানপত্র থেকে, যেখানে তিনি কলকাতার ও ঢাকার দুই ব্রাহ্মসমাজকে দাতব্য অনুষ্ঠান-কার্যের জন্য মাসিক কিছু টাকা বরাদ্দ করেছেন। অবশ্য, নববিধানের জন্যও করেছেন কিন্তু তার উপর দরদ একটু কম। আরও একটা বিষয়ে সাধারণ সমাজের উপর জোর পড়েছিল — যখন তিনি মায়ের মৃত্যুর পর একখানা চিঠিতে তাঁর দাদাকে (সত্যপ্রসাদ সেন) লিখেছিলেন যে, আড়াই হাজার টাকা তিনি মায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে দিচ্ছেন। এই দান যে শ্রদ্ধার ইঙ্গিত করে, তার চেয়ে অনেক বেশী শ্রদ্ধা তাঁর মায়ের উপর ছিল। এটা বলতেই আরেকটা কথা মনে এসে যায় — আমাদের খুব আশ্চর্য বোধহয় যে, পিতার স্মৃতিরক্ষার্থে তাঁর দান উল্লেখযোগ্য নয় — যদিও পিতার প্রতি শ্রদ্ধা মোটেই কম ছিল না। সেন মশায় তাঁর শয্যার শীর্ষে পিতার একখানা ফটো ঝুলিয়ে রাখতেন। তিনি পিতার বিষয়ে কোনও উল্লেখ করতেন না — যদি না বাল্যকালের কথা উঠতো। পিতা রামপ্রসাদ সেন ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ — যেমন তাঁর বলিষ্ঠ ধর্মজীবন, তেমন তাঁর বহুল কর্মজীবন। আমার মনে হয়, বারো-তেরো বছরের পুত্রের মধ্যে পিতার স্মৃতির রেখাপাত খুব অকিঞ্চিৎকর হবার কথা নয়।

অতুলপ্রসাদ লখনৌ এসে প্রথম থেকেই অযোধ্যা ব্রহ্মমন্দিরে যেতেন — শেষের দিকে তাঁর নিজের বাড়ীতেই রবিবার সকালবেলা উপাসনা হতো। এই অযোধ্যা ব্রহ্মমন্দির ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের একটি শাখা[১] —বিহারের এই রকম শাখা ব্রহ্মমন্দির মুঙ্গেরে ছিল এবং অন্যত্রও ছিল। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, এই লখনৌ মন্দির

১. পাঞ্জাবের একজন নববিধানী সভ্য নাম কাশীরাম — একটি রিপোর্টে

কোনো একটা বিশেষ সম্প্রদায় নির্মাণ করেনি। শুনেছি, লখনৌ শহরের কতিপয় বাঙ্গালী হিন্দু ও ব্রাহ্ম এবং সংযুক্ত প্রদেশের কতিপয় হিন্দু কেশব সেনের উপদেশ, উপাসনা, ভক্তিমাখা ভাষণ শুনে এত উৎসাহিত হয়েছিলেন যে, এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত করেন। এর পূর্বেই, রাজনারায়ণ বসু লখনৌ আসেন এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে ব্রহ্ম উপাসনার রীতি-নীতি ও আয়োজনের সূচনা করেন। বোধহয় লখনৌতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব কম ছিল এবং নববিধানীদের কর্ম ও উৎসাহ বেশী ছিল বলে প্রতিপত্তিও বেশী ছিল — আমরা দেখতে পাই, ভাই অঘোরনাথ গুপ্ত (নববিধানী) মহাশয়ের লখনৌতে আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতিফলক এই মন্দিরে স্থান পেয়েছে। এই ব্রহ্ম মন্দিরের পরিচালনার্থে শহরের অনেক লোক সাহায্য করতেন। তা ছাড়া, গত শতাব্দীর একজন বাঙ্গালী দানবীর বিশ্বনাথ রায় (যাঁর বিষয়ে আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি) তাঁর ট্রাস্ট থেকে মাসিক কিছু টাকা বরাদ্দ করে দিয়ে গেছেন। তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশব, ভাই অঘোরনাথ গুপ্ত, [১] রাজনারায়ণ বসু[২] প্রমুখ মনীষীগণের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত

(১৮৮৪ সনে) লিখেছেন যে সারা ভারতে ৪৯টি স্থানে এই ব্রাহ্মসমাজ মন্দির আছে — তন্মধ্যে লখনৌ, কানপুর, গাজীপুর, গয়া, মুঙ্গের, ভাগলপুর, ঢাকা, মৈমনসিংহ থেকে তাকে জানিয়েছেন যে তাদের নববিধানের সঙ্গে আত্মিক যোগ আছে।

১. সাধু অঘোরনাথ লিখেছেন "শাক্যমুনিচরিত ও নির্বাণতত্ত্ব।"

২. ইনি একজন আদি সমাজের নেতা গোঁড়া ব্রাহ্ম—মহর্ষির সাথী ও তাঁর ধর্মে কর্মে সহায়ক। আদি সমাজের সভ্যেরা বলেন, তাঁরা হিন্দুসমাজের গণ্ডীর ভিতরেই আছেন। কেশবচন্দ্র প্রণোদিত ১৮৭২ সনের সিভিল ম্যারেজ এ্যাক্টের ইনি ঘোর বিপক্ষবাদী আদি সমাজের পক্ষ থেকে, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র প্রণোদিত ১৮৫৬ সন-এর বিধবাবিবাহ এ্যাক্টের সমর্থনকারী। একদিকে হিন্দুত্বের দাবী করতেন, অন্যদিকে হিন্দুদের অবতারবাদ ও বেদ যে অপৌরুষেয় তা মানতেন না।

হয়েছিলেন। সেই জন্য মন্দিরটির উপরে তাঁর একটু দরদ ছিল। আমাদের সময়ে এই মন্দিরটি ভালভাবেই চলছিল — বিশেষ করে, যতদিন অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ রায় (নববিধানী) ও তাঁর স্ত্রী ইন্দিরা দেবী জীবিত ছিলেন।

আমরা আগেই বলেছি, অতুলপ্রসাদের ছাত্রজীবন কেটেছিল নববিধানীদের মধ্যে — পিতার প্রভাব তো তেরো বৎসর পর্যন্ত খুবই থাকার কথা। নববিধানীরা সামাজিক আচার-ব্যবহারে বিশেষ উদার, কারণ তাঁরা যে কেবল জাতিভেদ মানেন না তা নয়, তাঁরা সম্প্রদায়ভেদও মানেন না — তার উপর, বিশ্বভ্রাতৃত্ব তাঁদের কাছে একটি মূল মন্ত্র। সাধারণীরাও বর্ণভেদ মানেন না এবং উদার, কিন্তু সমন্বয়বাদ এঁদের মূল বিশ্বাসের ভিত্তি নয়। অতুলপ্রসাদ বর্ণভেদ, সম্প্রদায়ভেদ একেবারেই মানতেন না। তা ছাড়া, ভক্তি সেন মশায়ের জীবনে একটা বড় সম্পদ যা সাধারণীদের ব্রহ্ম-উপাসনায় বিশেষ স্থান পেতো না।[১] অতুলপ্রসাদের সঙ্গে মিশে মিশে আমরা খুব সহজে বুঝেছি যে, তাঁর মন কোন গণ্ডীতেই আবদ্ধ থাকতে চাইত না। তিনি যখন গান লিখে যাচ্ছেন, "হরি" সম্বোধনে, তখন তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অসন্তোষ মোটেই মনের মধ্যে স্থান দেননি। তাঁর গানে হরিনামের ছড়াছড়ি — কালাচাঁদ ও শ্যাম বেশ কয়েকখানা কবিতায় আছে — তিনি স্বাধীন ভাবে লিখে যেতেন। তিনি কি কখনও জানতেন না যে, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের বিখ্যাত প্রচারক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে প্রায় সমাজ-থেকে অপসারিত করবার চেষ্টা হয়েছিল? আমরা বইতে পাই — "a resolution forbidding the use of the name 'Hari'

১. ভক্তিবাদে সাধারণীদের ভয়, পাছে দেশে মানুষ-পূজা আরম্ভ হয়ে যায় — এই মত পোষণ করতেন মহর্ষিও। কিন্তু কেশব বলেন বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, চৈতন্য পূজার যোগ্য — তাঁরা মানুষ — কিন্তু অতি-মানুষ — এই মহাপুরুষ (Greatman)-দের যোগ্য সম্মান ভক্তি দিলে মন শুদ্ধ থেকে শুদ্ধতর হয়।

in the Sadharan Brahmo Samaj was passed compelling Pandit Bejoy Krishna Goswami to give up his preaching from the pulpit……" এ ব্যাপারটা তাঁর মনে ছিল কি না জানি না — তবুও এটা বুঝতে কষ্ট হয় না যে অতুলপ্রসাদ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতেন। আমার মনে হয় তিনি সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের[১] সভ্য ছিলেন এবং সাধারণ সমাজের অনেক সভ্যের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন নতুবা তাঁর দানপত্রে আর্থিক সাহায্যদানে সাধারণ সমাজকে এত উপরে স্থান দিতেন না, তার উপর এত শ্রদ্ধা ও রাখতেন না। এই শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও তিনি যদি স্বর্গ থেকে শোনেন যে, তাঁর হরি, শ্যাম ও কালাচাঁদ-মাখা কয়েকখানা গান সাধারণ সমাজ মন্দিরে গাওয়া কিছু কিছু সভ্যেরা অবাঞ্ছিত বলে পছন্দ করেন না, তখন তাঁর অন্তরাত্মা মুহূর্তের জন্য নিশ্চয়ই কেঁপে উঠবে।

•

এ সব আলোচনার প্রয়োজন ও গুরুত্ব তখনই আমরা বুঝতে পারবো, যখন ব্রাহ্মসমাজত্রয়ের তদানীন্তন ইতিহাস (অর্থাৎ বাংলার সামাজিক ইতিহাস) আমরা মুক্ত মনে আলোচনা করবো। আদি ব্রাহ্মসমাজ মুখ্যত ঠাকুরবাড়ী আর বাইরের গুটিকতক সভ্যের মধ্যেই সীমিত, নববিধান ও সাধারণ সমাজ নিজেদের মধ্যে এত বিরোধিতা করেছে ও তাদের মধ্যে এত অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে যে, সেগুলির পুনরাবৃত্তি এখানে নিষ্প্রয়োজন। এই ইতিহাস যারা জানেন তাঁরা এটাও জানেন যে, দুর্গামোহন দাশ ও শিবনাথ শাস্ত্রী ১৮৮৮ সনে বিলেত গিয়েছিলেন — উদ্দেশ্য আমাদের জানা নেই, কিন্তু আমরা পাই — তাঁরা ম্যাক্সমূলার, মার্টিনো ও মিস্ কোলেটের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ, আলাপ-আলোচনা করেছিলেন এবং তখন কেশবের আদর্শের ও

---

১. নিতান্ত হালে বিশ্বস্তসূত্রে জেনেছি তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ছিলেন।

কার্যাবলীর অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনাও করেছিলেন। তা সত্ত্বেও ম্যাক্স মূলারের ও মার্টিনোর কাছে কেশবের খ্যাতি কিছু মাত্র কমেনি। যাই হোক, এটা দেখা যাচ্ছে যে, দুই সমাজের মধ্যে মতবিরোধ দূর ইংলণ্ড পর্যন্ত পৌঁছে গেল। এর কয়েক বৎসর আগে থেকেই কলকাতার নববিধানী ও সাধারণীদের মধ্যে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনার মধ্য দিয়ে তীব্র মতান্তর প্রকাশ পাচ্ছিল।

কৈশোর পর্যন্ত অতুলপ্রসাদের জীবন যে ভাবে গড়ে উঠেছিল তা থেকে আমাদের একটা স্বাভাবিক সন্দেহ হয় এই যে, যে-দুর্গামোহন দাশের প্রতি তিনি অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতেন, তাঁর নেতৃত্বের[১] অধীনে (অর্থাৎ সাধারণ সমাজে) আসতে অতুলপ্রসাদের মন সায় দেবে না। অদৃষ্টের কী ক্রূর পরিহাস যে, যে-দুর্গামোহন দাশ কেশবচন্দ্রের ঘোর বিরুদ্ধবাদী[২] হয়ে উঠলেন, সেই দুর্গামোহন কেশবধর্ম-পোষক, কেশবের নববিধান-কর্মী ৺রামপ্রসাদ সেনের স্ত্রীকে বিবাহ করলেন। রামপ্রসাদের মৃত্যুর দিন এবং কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর দিনের মধ্যে বেশী তফাত ছিল না, সুতরাং রামপ্রসাদের স্ত্রী সুস্পষ্টভাবেই জানতেন যে, দুর্গামোহন দাশ, আনন্দমোহন বসু এবং শিবনাথ শাস্ত্রী কি ভাবে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধতা করেছেন। তাঁদের এই বিষয় নিয়ে আলোচনা যতটুকু প্রাসঙ্গিক তার বেশী আলোচনা এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু গৌণভাবে বিশেষ প্রয়োজন এইজন্য যে, আমাদের মূল উদ্দেশ্য এই যে, আমরা বুঝতে

১. সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে তিনজন বড় নেতার একটি বিশেষ গোষ্ঠী ছিল — দুর্গামোহন দাশ, শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু — একটু আলাদা ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী — পরে তিনি এ সব ছেড়ে দিয়ে বৈষ্ণব হয়ে নিজের পথ করে নিলেন।

২. কারণগুলি যতদূর বুঝতে পেরেছি তাতে মনে হয় অধ্যাত্ম জীবনের গভীরতার অভাবেই এই গোষ্ঠীকে আচার্যের পদ কেশবচন্দ্র দেননি।

চাই — এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, নিজের ধর্ম ও মাতাপুত্রের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে অতুলপ্রসাদের মনে সম্ভাব্য কি কি প্রতিক্রিয়া ন্যায়সঙ্গতভাবে আশা করা যায়। এটা ধরে নেওয়া যায় যে, একটা লজ্জা, দুঃখ, অপমান অতুলপ্রসাদকে চেপে ধরেছিল। দুর্গামোহন দাশের বিরুদ্ধে যে অসন্তোস ও অশ্রদ্ধা জমে উঠেছিল তিনি সেগুলিতে উদাসীন থেকে — দুর্গামোহন যে-সমাজের একজন নেতা, সে-সমাজকে কি করে সুনজরে দেখলেন — এটাই একটা বিশেষ রহস্য। এ সব প্রশ্ন স্বভাবতই চিন্তাশীল লোকের মনে আসে যে, অতুলপ্রসাদ কি করে তাঁর স্বর্গগত পিতার আদর্শে সম্পূর্ণ প্রভাবিত না হয়ে, নববিধানের সঙ্গে তাঁর পিতার ধর্মবিরুদ্ধবাদী সাধারণ-সমাজকে মিলিয়ে তাঁর দানপত্রে অর্থ বরাদ্দ করলেন। এর উত্তর এই হতে পারে যে, এ সব প্রশ্ন তাঁর মনকে চিন্তান্বিত করেনি যখন তিনি জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছিলেন। শুনেছি, অতুলপ্রসাদ তাঁর দানপত্রের বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে, একজেকিউটার দুজন 'প্রোবেট' নেবার পর তাঁর সমস্ত সম্পত্তি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের হাতে ন্যস্ত করবেন — যাতে সম্পত্তির আয় যে ভাবে ব্যয়িত হবে বলা আছে, সেই-ভাবেই দেওয়া হয়। একজেকিউটাররা 'প্রোবেট' নেবার পর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন এবং এখন দেখা যাচ্ছে, তাঁরা কৃতিত্বের সঙ্গে, সহানুভূতির সঙ্গে তাঁদের দায়িত্বভার বয়ে নিয়ে চলেছেন। সমস্ত ব্যাপারটা ভাবলে আমার মনে হয় যে, ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে অতুলপ্রসাদের কোনো গোঁড়ামি ছিল না — এমন কি তাঁর কোনো সুস্পষ্ট মতামতও ছিল না। কোনও সংকীর্ণ চিন্তা এ সব ব্যাপারে না এনে, উদার মনে সমস্ত সংস্থাকেই দানের নথিভুক্ত করে সাধারণ সমাজকে ও নববিধানকে এবং আরও কয়েকটি সংস্থাকেও কম-বেশী কিছু কিছু দিলেন। এটা লক্ষ্য করা নিতান্ত দরকার যে, তিনি কোনো ব্রাহ্মসমাজকে কিছুই দেননি — দিয়েছেন সমাজের

দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে। তিনি ধর্মমত বিষয়ে সত্যিই খুব উদার ছিলেন। উদার কেন — হয়তো বা বেশ উদাসীন ছিলেন। তিনি কখনও পৌত্তলিকতাকে অথবা ব্রাহ্মধর্মের মতামত নিয়ে, তর্কের মধ্যে আসেননি — কখনও আলোচনায় এসেছেন বলেও আমার মনে পড়ে না। আমরা কখনো তাঁর কাছে এ প্রশ্ন উত্থাপন করিনি, তবে আমার আন্তরিক বিশ্বাস যে, বর্তমান সামাজিক রূপান্তরের তথ্যানুসন্ধান করতে, ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের ক্রমবিবর্তন (১৮৩০ সনে রাজা রামমোহন কর্তৃক ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার সময় থেকে) প্রত্যেক বাঙ্গালীর তথা ভারতবাসীরই জানা একান্ত আবশ্যক।

অতুলপ্রসাদ — জনসেবক ও কর্মী

১৯০২ সনের প্রারম্ভেই অতুলপ্রসাদ বিলেত থেকে দেশে ফিরলেন এবং লখনৌতে ব্যারিস্টারী করতে আরম্ভ করলেন। বছর খানেকের মধ্যেই প্রতিপত্তি হতে লাগলো। ১৯০২ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত খুব পরিশ্রম করে সফলতার দিকে এগুচ্ছিলেন — লখনৌতে বেশ সুনাম হতে লাগলো। একদিকে কাজের চাপ, অন্যদিকে পারিবারিক অশান্তি বাড়তে লাগলো — এই সময়ের পারিবারিক ইতিহাস নিতান্ত আপন লোক ছাড়া কেউ জানতো বলে আমার ধারণা নেই। আগেই বলেছি, এই সনেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অতুলপ্রসাদ রামগড়ে দু'সপ্তাহ কাটিয়েছিলেন — শুনেছি তখন, মনটা তাঁর খুবই ভারাক্রান্ত ছিল। ফিরে এলেন — প্র্যাক্‌টিস্ ভালই চলছে — কেবল প্রাক্‌টিস্ ভাল চলছে তাই নয় — তিনি সহরের সমস্ত বড় কাজে বাঙালী-অবাঙালী সমাজের সঙ্গে যোগসূত্র রাখতেন অর্থাৎ যাঁরা শহরের হিত-সাধনার্থে অতুলপ্রসাদের কাছে আসতো, তাঁদের তিনি যোগ্য সমাদর দেখাতেন।

ফলে, বেশীর ভাগ সামাজিক অনুষ্ঠানে, শহরবাসীদিগের সুখেদুঃখে তাঁদের সঙ্গ দিতেন যতটা সম্ভবপর হতো। শহরের উন্নতির জন্যও সেন মশায়, গঙ্গাপ্রসাদ বর্মার সাহায্যে, নানারকম চেষ্টা করেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে একদিকে 'সেন মশায়ের প্র্যাক্‌টিস্‌ ভাল হচ্ছে, শহরে প্রতিপত্তি হয়েছে, শহরের অনেক সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করছেন; অন্যদিকে, পারিবারিক আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হলো — অশান্তি এমন দারুণ রূপ ধারণ করলো যে, অতুলপ্রসাদ প্র্যাক্‌টিস্‌ ছেড়ে ১৯১৫ সনে কলকাতায় চলে গেলেন। শুনেছি, যাবার উদ্যোগে, লখনৌর প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল ওহদেদার, চীফ্‌কোর্টের নগেন্দ্রনাথ ঘোষাল প্রভৃতি অনেকেই বিরোধ মেটাবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কিছুই ফল হলো না। অতুলপ্রসাদ সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লেন। প্রায় এক বৎসর কলকাতায় কাটালেন। ১৯১৬ সনের প্রথম দিকেই সেন মশায় আবার লখনৌ ফিরে এসে একখানা ভিন্ন বাড়ী নিয়ে থাকতে আরম্ভ করলেন। ১৯১৬ থেকে ছয় বৎসরের ইতিহাস আমরা খুবই কম জানি। একমাত্র তাঁর ভ্রাতৃপ্রতিম হেমন্ত ঘোষ ও সত্যকুমার মুখার্জি জানতেন। শুনেছি, পসার ফিরে পেতে, আর প্রতিপত্তি ফিরে পেতে তাঁর বেশীদিন লাগেনি। আর একজন সর্বজনপ্রিয় প্রোফেসর সেন মশায়কে জানতেন — অরুণপ্রকাশ ব্যানার্জি। তিনি এখন অসুস্থ হয়ে আছেন। অতুলপ্রসাদের সঙ্গে ছোট ভাইএর মতো নিবিড়ভাবে মিশেছেন তিনি। প্রসঙ্গক্রমে কথাবার্তা বলতে বলতে তিনি আমাকে একটি লেখা দিলেন —

"যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাহা লিপিবদ্ধ করিতে চাই। বিশ বৎসর পূর্বের কথা (অর্থাৎ ১৯১৬ সাল) গোমতীতে বন্যা আসিয়াছে, অবিরাম মুষলধারায় বৃষ্টির জন্য লখনৌ নগরীর গরীবদের পল্লীগুলি বিধ্বস্ত হইয়াছে। অনেক স্ত্রীপুরুষ ছেলেমেয়েদের হাত ধরিয়া

নগরের রাজপথে আশ্রয় লইয়াছে। অতুলপ্রসাদ সন্ধ্যার সময় আমাদের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া পদব্রজে যাইতেছিলেন। আমিও গিয়া তাহার সহিত সম্মিলিত হইলাম। তাহার সহিত সেদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত ঘুরিয়া ছিলাম। গরীবদের অর্থ দিয়া, স্কুল মন্দির বা অন্য কোনো জনসাধারণের আবাসস্থলে তাহাদের জন্য আশ্রয় করিয়া দিয়া তিনি যে প্রকারে অর্থহীন নিরাশ্রয়দের সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা আমি কখনো ভুলিব না।......অর্থের চেয়ে বড় দাম ছিল তাঁর অন্তরের ভালবাসা, যাহার জন্য সবাই মুগ্ধ হইয়া যাইত ও তাঁহাকে ভুলিতে পারিত না।")

উপরের এই লেখাটা পড়েই আমার মনে হলো, হয়তো এমন দুর্দিনেই অতুলপ্রসাদ এই গানটি রচনা করেছিলেন —

ওহে পুরজন দাও কিছু ধন
প্লাবনপীড়িত জনে
তব দেশবাসী, করে হাহাকার
অন্ন গেহ বিহীনে। ......

দুঃস্থদিগের প্রতি এইরকম মনোভাব এবং দুঃখ নিবারণের চেষ্টা প্রকৃতই মহাপ্রাণের পরিচয়।

তাঁর যৌবনে এই রকম অভিজ্ঞতা আমি আরও শুনেছি — সমাজ-কর্মী হিসাবে তাঁর সুনাম ছিল। তবে এটাও স্বীকার করতে হবে যে, এত বড় সুনামটা হয়েছিল তার কারণ, কৃতী ব্যারিস্টার বলেই। আমি ভেবে দেখেছি যে, আমি আমার চোখের সামনে আর একজনকেও দেখতে পাচ্ছি না, যে উচ্চপদস্থ হয়েও এত বড় সহায়ক এবং মহাপ্রাণ। সত্যই এটা খুব কম দেখা যায় যে, যখন অর্থাগম যথেষ্ট হতে থাকে তখন প্রতিষ্ঠাবান্ লোক মুক্তহস্ত হয়ে সমাজ সেবায় অর্থ নিয়োজিত করেছেন। কটা লোক পুত্রকে সমস্ত সম্পত্তি না দিয়ে, দেশের অনুন্নত দুঃস্থ সংস্থাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য চিরকালের বন্দোবস্ত

করে গেছেন ? — হোক তাঁর সাহায্য অতি অল্প, অতি নগণ্য ! তিনি যেমন উপার্জন করছিলেন এবং লোককে ও সংস্থাকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করছিলেন, তেমন যৌবনে নিজের দৈহিক সামর্থ্য দিয়ে লোকের দুঃখ-কষ্ট মোচনে অগ্রসর হতেন। শেষ দশ বৎসর আমরা যা দেখেছি তাতে তাঁকে দৈহিক পরিশ্রমে লিপ্ত থাকতে দেখিনি — সর্বদাই দেখেছি তিনি আপন কাজে ব্যস্ত থাকতেন — সাক্ষাৎকারীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন। তাঁকে প্রেসিডেণ্ট রেখে আমরা (সংস্থার সেক্রেটারীরা) বিভিন্ন সমাজসেবামূলক সংস্থা পরিচালনা করতাম — প্রয়োজন হলেই সাক্ষাৎ করতে আসতাম।

অতুলপ্রসাদ ও তাঁর আইনব্যবসায়

অতুলপ্রসাদ ব্যারিস্টারী পড়তে গেলেন ১৮৯১ সনে এবং পাশ করে লণ্ডন থেকে ফিরে এলেন ১৮৯৫ সনে। কিছুদিন কলকাতায় প্র্যাক্‌টিস্ করলেন। কিন্তু সঙ্গীতপ্রিয়তা এত বাধা সৃষ্টি করলো যে, ব্যবসা ভাল জমলো না, যদিও তিনি এস. পি. সিংহের জুনিয়ার হয়ে কাজ করছিলেন। জুনিয়ারের পক্ষে সঙ্গীতের আসর আর ক্লাব-লাইফ দুটিই ক্ষতিকর। তাছাড়া পারিবারিক জটিলতাও একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। যে-বিবাহের চিন্তা তিনি দূরে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন সেটা হলো না — দ্বিতীয়বার বিদেশ গেলেন — স্কটল্যাণ্ডে বিয়ে হলো — ১৯০২ সনে ফিরে এসে লখনৌতে প্র্যাক্‌টিস্ আরম্ভ করলেন। এবার বিলেতে থাকার সময় তাঁর দুটি পরম বন্ধু লাভ হয় — দুটিই — লখনৌর বড় ঘরের মুসলমান — লণ্ডনে ব্যারিস্টারী পড়তে গিয়েছিলেন — একজনের নাম মমতাজ হোসেন আর একজনের নাম আলি আউসড্। এদের দুজনার কথায়, ব্যবহারে, বন্ধুত্বে এত বিশ্বাস

জন্মেছিল যে, তিনি লখনৌতে প্র্যাক্‌টিস্ করা স্থির করে ফেললেন। অতুলপ্রসাদ প্রথম এসে ব্যারিস্টার মমতাজের অতিথি হয়ে কিছুদিন ছিলেন, তারপর বাড়ী ভাড়া করে অন্যত্র গেলেন। এঁদের সঙ্গে বন্ধুত্ব চিরকাল ছিল। এঁদের প্রথম সাহায্যে এবং নিজের পরিশ্রমে তিনি ব্যবসাতে উন্নতি করতে লাগলেন। তাছাড়া বাঙালী সমাজের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিও তাঁকে সাহায্য করেছিলেন — ব্যবসা ক্ষেত্রে যাঁদের কাছ থেকে সাহায্য পেলেন তাঁরা বিপিন বোস (ঝাউলালপুল), রামলাল চক্রবর্তী, নগেন ঘোষাল (গোলাগঞ্জ), মহেন্দ্র ওহদেদার (ডাক্তার) প্রভৃতি। ব্যবসায় সফলতার সঙ্গে নতুন বন্ধু হলেন — বিশ্বেশ্বরনাথ শ্রীবাস্তব (পরে চীফ জাস্টিস হলেন), জাস্টিস্ গোকরননাথ মিশ্র, জুনিয়ারদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যারিস্টার হেমন্ত ঘোষ, মুবাশ্শির কিদওয়াই (পরে জাস্টিস হলেম), বীরেন রায় (জুনিয়ার স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল হলেন) এবং ব্যারিস্টার সুধীন দাশ প্রভৃতি। শেষে অতুলপ্রসাদ আউধ আইনজ্ঞ সভার নেতা হলেন। একটা সময় এলো যখন আইন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আর তখনকার চীফ্ জাস্টিসের একটা ভীষণ বিরোধ উপস্থিত হয়, কারণ আইন ব্যবসায়িগণ চীফ্ জাস্টিসকে পক্ষপাতিত্ব-দোষে দোষান্বিত করেন। বিরোধটা যখন অতিমাত্রায় এসে পৌঁছুলো তখন এ. পি. সেন আউধ আইন সভার লিডার (Leader of Oudh Bar)। লিডার বলে এ. পি. সেনকে এই ব্যাপারে নেতৃত্ব নিতেই হয়েছিল। এই সব অপ্রীতিকর উত্তেজনাপূর্ণ ব্যাপারের দায়িত্ব খুব অনিচ্ছাতেই নিতে হয়েছিল। নেতার দায়িত্ব যখন একবার নিলেন কর্তব্যের খাতিরে, সত্যনিষ্ঠার খাতিরে, তখন তিনি যে সাহস, নির্ভীকতা ও দৃঢ়তা দেখিয়েছিলেন তাতে তাঁর খ্যাতি সমস্ত সংযুক্ত প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ে। আমরা দিনের পর দিন তাঁকে এ বিষয়ে ব্যস্ত, লিপ্ত, চিন্তিত দেখেছি আর আমাদের কেবল এই চিন্তাই হয়েছে যে, রক্তের চাপ অতিমাত্রায়

বৃদ্ধি পেলে সেন মশায়ের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়বে। এ বিরোধের ফলে আদালতের নৈতিক অবস্থা অনেক ভাল হয়েছিল কিন্তু সেন মশায়কে কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম নিতে হয়। তখনও গীতরচনা চলেছে, ভালসময়ে তো কথাই নেই। এই সুখ্যাতির সঙ্গে সঙ্গে অর্থাগম সহজ হলো। কিন্তু বহু আগে থেকেই আর্থিক সচ্ছলতা ভালই দেখা যাচ্ছিল। অতুলপ্রসাদের মন এ সময় থেকেই যেন অধিকতর স্নেহশীল হয়ে পড়েছিল। ফলে, মাসী বোন এবং অন্যান্য আত্মীয়ের প্রতি ভালবাসা, স্নেহ, মায়া-মমতা সবই অতুলপ্রসাদের জীবনকে উত্তরোত্তর মধুর করে তুলছিল। পুরোনো অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য যে সব বাধা এসে পড়েছিল সেগুলি যেন মন থেকে দূরে চলে যেতে লাগল। জীবনের সফলতায় মানুষের মন আত্মতৃপ্তিতে ভরে যায় — অতুলপ্রসাদের সরস কবি-মন আত্মীয়-স্বজনের দিকে দুর্বার বেগে ছুটে চলল। একে তো অতুলপ্রসাদের পক্ষে এই স্নেহ-প্রবণতা স্বভাবসিদ্ধ, তাঁর উপরে ক্রমবর্ধমান যশ ও তৃপ্তি অনেক বাধা সরিয়ে দিল। কিন্তু স্বাস্থ্য তাঁকে পীড়া দিতে ছাড়লো না — রক্তের চাপকে তিনি কিছুতেই কমাতে পারছিলেন না। কখনও কলকাতা যাচ্ছেন — স্টিমলঞ্চে অন্তত আট-দশ দিন কাটিয়ে রক্তের চাপ কমাচ্ছেন — আবার ফিরে এসে তালুকদারী মামলা — আবার কিছুদিন পর পুরী যাচ্ছেন — আবার ফিরে এসে নিজের চেম্বার। আমরা সঙ্গ দিয়ে মনটাকে কিছু হাল্কা করে দিতাম। আবার যখন প্রয়োজন হতো, তিনি চলে যেতেন তাঁর জেঠ্‌তুত ভাই সত্যপ্রসাদ সেনের কাছে — কিছু বিশ্রাম নিয়ে আবার কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতেন। কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতে হয়েছে ঠিকই, কিন্তু শেষের দিকে সমস্ত জজ আর বন্ধুব্যারিস্টারদের কাছ থেকে আদালতের কাজে সহায়তা ও সৌজন্য পেতেন এবং তাঁর কাজটা হাল্কা হয়ে যেতো। তিনি লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সমিতিতে (অর্থাৎ University Court) অথবা কার্যকরী সমিতিতে যখন কথা বলতেন তখন তাঁর

চেহারায় কবি-অতুলপ্রসাদ থাকতো না, একেবারে অন্যরকম হয়ে যেতো — বঙ্কিম গ্রীবা, চোস্ত ইংরাজী, প্রকাশে বিলিতী ঢং, একটু মেজাজ, একটু তোতলান —সব মিশিয়ে লক্ষ্যভেদী ভাষণ দিতেন, কিন্তু খুব প্রয়োজন না হলে কথাই বলতেন না। শুনেছি, কোর্টেও ভাল বলতেন। এলাহাবাদে ছিল যুক্তপ্রদেশের হাইকোর্ট — সেখানে বড় আইনজ্ঞ ছিলেন লালগোপাল মুখার্জি, সুরেন সেন, পিয়ারীলাল ব্যানার্জি, সতীশ ব্যানার্জি, তেজবাহাদুর সপ্রু, মতিলাল নেহেরু, কৈলাসনাথ কাটজু প্রভৃতিরা। এঁদের সকলের সঙ্গেই এ. পি. সেনের খুব যোগাযোগ ছিল। লখনৌ ছিল বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সুয়োরাণী (De facto Capital) — তাকে একটা বিশিষ্ট উচ্চপদ না দিলে তিনশো রাজামহারাজা তালুক্‌দারেরা (Barons of Oudh) খুশী থাকেন না (যাদের জন্য স্পেশাল তালুকদারী আইন) সুতরাং লখনৌকে খুশী রাখবার জন্য দিতে হয়েছিল দুটি জিনিস যা সকল সমাজেই দেশের সংস্কৃতির মাপকাঠি : একটি হাইকোর্ট, আর একটি বিশ্ববিদ্যালয়। এক প্রদেশে দুটি হাইকোর্ট থাকতে পারে না বলে লখনৌতে চীফ কোর্ট দেওয়া হলো — পরে হাইকোর্টের বেঞ্চ হয়ে গেল ; আর লখনৌ ও তার চতুর্দিকের দশমাইল এলাকাকে লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আনা হলো। এ. পি. সেন সহকর্মী হিসেবে চীফ কোর্টে পেলেন জ্যাকসন্‌, জগৎ নারায়ণ, গোকরণনাথ মিশ্র, বিশ্বেশ্বরনাথ শ্রীবাস্তব, জয়করণনাথ মিশ্র, বাহাদুরজী, ওয়াসিম, মমতাজ আউসড, সমীউল্লা বেগ, মুবাশ্বির কিডওয়াই, রাধাকৃষ্ণ, লক্ষ্মীশংকর প্রভৃতিকে।

অতুলপ্রসাদ ও তাঁর রাজনীতি

অতুলপ্রসাদের মতো শান্তিপ্রিয় লোক আইন ব্যবসায়ে বিশেষ সফলতা লাভ করে, দিনের বেশীর ভাগ সময় নিজের পেশা নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন। আর বাকী সময়টা কাট্‌তো দোতলায় একা বসে থেকে — সঙ্গীতচিন্তায় ও সঙ্গীতসৃষ্টিতে। এই গানই তাঁর প্রাণের খোরাক জোগাতো — এই মর্মে অতুলনীয় ভাষায় সরোজিনী নাইডু অতুলপ্রসাদের আবক্ষ মর্মর-মূর্তি স্থাপনের সময় নিজের বন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছিলেন। রাজনীতির তাগিদে কাজের চাপ সময়ে সময়ে তাঁর অত্যন্ত বেড়ে যেতো।

অতুলপ্রসাদ প্রথম থেকে ১৯১৬।১৭ পর্যন্ত কংগ্রেস কর্মী ছিলেন এবং লখনৌ কংগ্রেসে বিশেষ স্থান পেয়েছিলেন — একই সঙ্গে রিসেপ্‌সন কমিটির একজন সেক্রেটারী আর স্বেচ্ছাসেবী দলের নেতৃত্ব[১] তাঁর উপর ন্যস্ত হয়েছিল। পরে যখন মণ্টেগুর (Montagu) ডায়ারকী (Dyarchy) এলো, তখন নিজেদের মধ্যে তুই ভাগ হয়ে গেল, অতুলপ্রসাদ তখন মডারেট হয়ে রইলেন সার তেজবাহাতুর সপ্রু ও সি. ওয়াই. চিন্তামণির দিকে।

অতুলপ্রসাদ সেনের বাড়ীর সামনের উদ্যানে সামিয়ানার তলায় যে আন্দোলনের সূত্রপাত হলো — সে বৈঠকে পণ্ডিত জগৎনারায়ণ মোল্লা (কাশ্মীরি হিন্দু যিনি হাণ্টার কমিশনের বাঘা মেম্বর ছিলেন) সভাপতি ছিলেন — এখানেই সংযুক্ত প্রদেশের লিবারল্‌ লীগ সৃষ্টি হলো — অতুলপ্রসাদ তার একজন নেতা। পরে বেনারসে প্রাদেশিক লীগের

---

১. আমার বন্ধু বসন্ত ঘোষাল তাঁর অধীনে ভলাণ্টিয়ার ছিলেন। তখন সেন মশায়ের বয়স ৪৭ বৎসর। পঞ্চাশের পর শ্রমসাধ্য কাজ সম্ভবপর হয়নি।

(Provincial League) সভাপতিত্ব করেন। আবার পরে লখনৌতে যখন অল্ ইণ্ডিয়া লিবারল্ ফেডারেশনের (All India Liberal Federation) অধিবেশন হয়, তখন তিনি তার রিসেপ্ সন্ কমিটির (Reception Committee) সভাপতিত্ব করেন। তিনি যে সময়ের মানুষ এবং শিক্ষায়, দীক্ষায়, ব্যবসাক্ষেত্রে যে স্থান অধিকার করতে চলেছিলেন তাতে তাঁকে অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষই বলা উচিত — কথাবার্তায়, চালচলনে, ব্যবহারের উদারতায়, দান-ধ্যানে আভিজাত্যের গৌরব তাঁর যথেষ্টই ছিল — সুতরাং লিবারল পার্টিতে গিয়ে নেতা হবেন তাতে সন্দেহ ছিল না। অন্যান্য বিশিষ্ট সভ্যেরা যেমন স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, হৃদয়নাথ কুঞ্জরু, জয়াকর, চিন্তামণি, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী প্রভৃতিরা অতুলপ্রসাদকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখতেন এবং তাঁর সহকর্মী ছিলেন। ১৯৩৩ সনে সংযুক্ত প্রদেশের লিবারল্ পার্টির সম্মেলন এলাহাবাদে হয় — এই অধিবেশনে অতুলপ্রসাদ নেতৃত্ব করেন। তাঁর ভাষণের এক অংশ উদ্ধৃত করলাম —

"……The constitution proposed in the White Paper is certainly not Dominion Status nor any real self-government. It is a catalogue of safeguards rather than proposal for real autonomy…… I deplore separate electorates……we are not the architects of our own destiny but suppliants before another nation for favour No self-respecting Indian can help feeling humiliation for such an atject position."

অতুলপ্রসাদ এই দলের বাৎসরিক অধিবেশনে প্রধান অধিনায়ক হয়ে সুবক্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি বার বার চেয়েছিলেন যাতে ভারতে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতি আর ঐক্য স্থাপিত হয় — যাতে হিন্দু সম্প্রদায়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয়। তিনি কংগ্রেসের উত্তেজনা,

গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন ইত্যাদি দেখে মোটেই কংগ্রেস-নীতিকে সমর্থন দিতে পারেননি। যদিও গান্ধীজির সমাজসংস্কার ও হরিজন উন্নয়নের জন্য ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন এবং গান্ধীজির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অসীম।

১৯২৪ পর্যন্ত তবুও লিবারল্ পার্টির কর্মসূচী বিবেচনা-সাপেক্ষ ছিল কিন্তু তারপর কংগ্রেস পার্টির জোর এত বাড়তে লাগলো যে লিবারল্ পার্টি আর জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারল না। কালক্ষেপে রাজনীতি কোথায় যায় তাও আমরা দেখলাম — যে কংগ্রেসের দাপটে সমস্ত ভারতবর্ষ একদিন কেঁপেছিল, আজ সেই কংগ্রেস মৃত। এঁদের দান ও আত্মোৎসর্গ তখনকার সময়ে যত বড়ই হোক না কেন, আজ বর্তমান ভারতের রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে এসব আলোচনা নূতন আলোক ফেলতে পারবে না। এইটুকু বললেই আমার মতে যথেষ্ট হবে যে, অতুলপ্রসাদ সেই সময়ে তার ক্ষমতা মতো দেশ-সেবা করেছিলেন — চিন্তা দিয়ে, অর্থ দিয়ে, ভাষণ দিয়ে, লেখনী দিয়ে।

অতুলপ্রসাদের মতো লোক ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে কাজ করে করে শেষের দিকে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে সায় দিতে পারলেন না কারণ তখন দেশময় হিংসাত্মক রেষারেষি চলেছিল। কি করে কবির পক্ষে এসব সহনীয় হতে পারে ? — যাঁর সমসাময়িক হলো স্যর অতুল চ্যাটার্জী, স্যর বি. এল. মিত্র, প্রোফেসর এম. এম. ঘোষ, সরোজিনী নাইডু, সি. আর. দাস, অরবিন্দ ঘোষ, গোখ্লে, জগদীশ বসু, স্যর এন. এন. সরকার, আর পরাণজপে, লর্ড সিংহ, স্যর সপ্রু, মতিলাল ইত্যাদি এবং যিনি ব্যারিস্টারীতে সফলতা অর্জন করেছেন। দু'একজন ছিট্‌কে বেরিয়ে পড়বে, একটা কোনো বিশেষ প্রেরণায় সেটা স্বাভাবিক। এই সকল সমসাময়িকদের মধ্যে কিছু কিছু তাঁর বাড়ীতে অতিথি হয়ে থেকে গেছেন এটা আমি দেখেছি। তিনিও

বম্বেতে, পুণাতে গেছেন এবং এই সব বন্ধুদের অতিথি হয়েছেন। এঁদের বেশীর ভাগের সঙ্গে রাজনীতিতেই যোগ ছিল, কোনও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে বা তেমন পরিবেশে যুক্ত ছিলেন না।

অতুলপ্রসাদের শেষ জীবন

অতুলপ্রসাদের জীবনের শেষ পাঁচ-ছয় বৎসর সুস্থ শরীরে কাটেনি। হঠাৎ একদিন ধরা পড়লো রক্তের চাপ বড় বেশী বেড়ে চলেছে। আমরা দেখেছি যে, মাসের প্রথম অর্ধেক তিনি আপনার ব্যবসা কার্যে ব্যস্ত থাকতেন – যদিও গানের আসর কিছু-না-কিছু চলতোই, তবুও প্র্যাকটিসের দিকে সতর্কতার অভাব ঘটেনি। যতই তিনি নিজের কাজে ব্যস্ত থাকুন না কেন, আমরা তাঁর কাছে পৌঁছুলে, তিনি আফিসঘর ছেড়ে বসবার ঘরে চলে আসতেন — আমরা আপত্তি জানালেও তিনি শুনতেন না, বলতেন, "ব্যবসা তো চলবেই—মক্কেলরা ঘণ্টা-খানেক অপেক্ষা করলে তাদের কি ক্ষতি হবে? আমি একটু নিজের মনটাকে তাজা করে নিই —মাথাটাকেও একটু বিশ্রাম দিই।" কিছুক্ষণ গল্প করে নিজের কাজে চলে যেতেন — এতে তাঁর সত্যিই আনন্দ হতো।

আমি একদিন একাই তাঁর কাছে গেছি। অনেক কথাবার্তার পর বললেন, "কয়েকদিন একনাগাড়ে পরিশ্রম করলেই তো রক্তের চাপ বাড়ে — এখন চাপটা উপরের দিকে — শীগগিরই কলকাতায় যাব ঠিক করেছি — দশবারো দিনের জন্য। কলকাতা গিয়েই স্টীমারে গোয়ালন্দ ট্রিপটা করবো — আটদশ দিন গঙ্গার উপরে স্টীমারে কাটালে চাপটা কমে আসে — বিশ্রাম তো পাবোই — মাসের শেষের দিকটায় ফিরবো — হাজার চারেকের উপার্জন হয়ে গেছে — এতেই আমার বেশ চলে যায়।" শেষের তিনচার বৎসর

মোটামুটি এই ব্যবস্থাই ছিল — মাঝে মাঝে ঐ ট্রিপটা না নিয়ে পুরী চলে যেতেন অথবা সুন্দরবন ডিস্‌প্যাচে গিয়ে ফিরে আসতেন। মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি পুরীতেই গিয়েছিলেন। লখনৌ থেকে কলকাতায় এসে তিনি বেশীর ভাগ সময় তাঁর মামাতো ভাই জজ যতীন গুপ্তের বাড়ীতেই থাকতেন — কখনও তাঁর বোন্ কিরণ বোসের বাড়ীতেও উঠতেন — কখনো খোদন ভাই-র কাছে।

অতুলপ্রসাদ ছিলেন সুপুরুষ — দীর্ঘ সুগঠিত দেহ — অনিন্দিত স্বাস্থ্য — গাম্ভীর্যভরা প্রতিভাদীপ্ত মুখ, ধীর, স্বল্পভাষী। কিছুদিন পরিচয়ের পর কথাবার্তা থেকে বুঝতে পারা যেত তিনি কি রকম রসস্রষ্টা ও রসবোদ্ধা। বছরে দুতিনবার আমার অগ্রজ মাসতুতো ভাই শান্তিনিকেতনের ক্ষিতিমোহন সেন যখন শান্তিনিকেতন থেকে লখনৌ আসতেন তাঁর জামাতা প্রোফেসর শৈলেন দাশগুপ্ত ও কন্যা মমতার কাছে, আমার বাড়ীতে সাহিত্য বৈঠক হতো — আর তখন আমি ওঁকে দু'তিনদিন পরপরই অতুলপ্রসাদের বাড়ীতে নিয়ে যেতাম। সেই সময় অতুলপ্রসাদের আনন্দ ফুটে উঠতো। ক্ষিতিদা ছিলেন শান্তিনিকেতনের ঠাকুর্দা — নামকরা সুরসিক — তার উপরে তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সহচর — ভারতের বহির্ভ্রমণে কয়েকবার তিনি সহচর ছিলেন। অতুলপ্রসাদ ছিলেন কবিগুরুর অতি স্নেহভাজন কনিষ্ঠ ভ্রাতৃতুল্য। এই দুই জনের (ক্ষিতিমোহন সেন আর অতুলপ্রসাদ) মিলনে যে সব কথাবার্তা হতো তাতে হাসির খোরাক যথেষ্ট পাওয়া যেতো, কারণ আমার দাদা যে কেবল রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে এসে ভারতের বিদগ্ধ জনের একজন তা নয়, তিনি সমস্ত ভারত পর্যটন করে একজন খ্যাতনামা পর্যটকও হয়ে ছিলেন, তা ছাড়া তাঁর জন্ম কাশীতে — শিক্ষা কাশীতে, যে-স্থান প্রাচীন ভারতের ধর্মভূমি — যার অলিতে-গলিতে মহাপ্রসিদ্ধ সাধু-সন্তদের জীবন ছড়ান ও জড়ান। অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন কয়েক বৎসর তাঁর পৈতৃক

ভিটায়, (সোনারঙ্গে, বিক্রমপুর) কাটিয়েছেন — তখন ঢাকা ও মৈমনসিংহের উল্লেখযোগ্য গ্রামগুলিতে ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তখন তাঁর অনেক গ্রাম্য ছড়া কণ্ঠস্থ হয়েছিল। অতুলপ্রসাদের ঘরে বসে ক্ষিতিদা যখন গ্রাম্যতাদোষযুক্ত ছড়া বলতেন তখন তিনি যে কি হাসি হাসতেন তা বলা যায় না, কারণ তাঁর শৈশবের কথা মনে হতো এবং গ্রাম্যতাদোষযুক্ত ছড়া কিছু তাঁরও জানা ছিল। মাঝে মাঝে অতুলপ্রসাদ শুনতে চাইতেন ক্ষিতিমোহন সেনের কাছ থেকে মধ্যযুগের মুসলমান সাধকদের কথা, যেমন কবির, দাদু, রজ্জব ইত্যাদি। আবার একদিন হয়তো শুনলেন হিন্দুসাধকদের কথা যেমন তুলসীদাস, সুরদাস, জগন্নাথ ইত্যাদি। কোনোদিন হয়তো জিজ্ঞাসা করলেন আবু-রিহান অল্‌বিরুনীর কথা, কোনোদিন আবদর রহিম খান-খানা, কখনো দারা-সেকোর কথা। এ সব ইতিহাস গল্পের মতো করে ক্ষিতিদা এত রস দিয়ে পরিবেশন করতেন যে অতুলপ্রসাদ অতি আগ্রহের সঙ্গে শুনতেন। আজ ঐ সব ঘরোয়া আসরের কথা মনে করলে, সঙ্গে সঙ্গে মনে আসে অতুলপ্রসাদের শ্রাদ্ধ বাসরের কথা যার আচার্যও হয়েছিলেন সেই ক্ষিতিমোহন সেন। আজ সে অতুলপ্রসাদও নেই আর ক্ষিতিমোহন সেনও নেই।

অতুলপ্রসাদের চরিত্রের নির্মলতা, দৃঢ়তা, মনের প্রসারতা ও অকপট বন্ধুত্বের জন্য সর্বদাই তাকে সাধারণ মানুষের অনেক উপরে স্থান দেওয়া হতো। একদিকে চরিত্রের মাধুর্য, ব্যবহারের শালীনতা, অন্যদিকে, কবিত্বের উৎস আর রসের ভাণ্ডার — এই ছিল তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। পরিশ্রম ও প্রতিভার ফলে কর্মজীবনে পেয়েছেন সফলতা, বন্ধুবান্ধব থেকে পেয়েছেন প্রীতি, জনসাধারণ থেকে পেয়েছেন শ্রদ্ধা ও ভালবাসা — আবার সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছেন দুঃখ, অশান্তি, অপমান আর সব চেয়ে বেশী — নৈরাশ্য। এই মানসিক অন্ধকারে, তাঁর কবিতা আর গান জীবনকে আনন্দময় করে রাখতো —

অন্তরাত্মার তৃপ্তি সাধন করতো। তাই কবি সরোজিনী নায়ডু (যুক্ত প্রদেশের রাজ্যপাল থাকাকালীন) একটি ছোট্ট অপূর্ব ভাষণ আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন, ১৯৪৮ সনের সেপ্টেম্বর মাসে যখন তাঁর মর্মর মূর্তি স্থাপিত হয়। সেটি উদ্ধৃত না করে পারলাম না —

"I deeply regret that I have sustained an injury to my leg and hence must forego the pleasure of unveiling the marble bust of my old and dearly valued friend Atul Sen. I do not remember a time when I did not know him or have his exquisite Bengali poetry. He chose Law for his bread but Poetry was his Narcissus flower, food for the soul, which fulfilled as it is said in the Hadis, an injunction of the prophet Mohammad who said, "if thou hast two loaves of bread, go and sell one for the flower of Narcissus, for bread feeds the body, but the flower of Narcissus is food for the soul" Atul Sen's genius, for it was genius and not only talent, had the authentic lyric note which moved deeply the hearts of all who heard his songs. He had the gift of poignant and beautiful word in which he interpreted the most profound and subtle emotions and experience of his soul. There are and will be many lawyers in the world but only one Atul Sen the poet who has assured his own immortality through the medium of his lovely lyric genius.······"

এই গান ছিল অতুলপ্রসাদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। বয়সের সঙ্গে যতই

অভিজ্ঞতা বাড়ছিল, জীবনের সমস্যাগুলি যতই প্রখর হচ্ছিল ততই সংস্কারমুক্ত হচ্ছিলেন, মন খুলে জীবনদেবতার উদ্দেশে গান গাইতে লাগলেন — তাই আমি বলি, অতুলপ্রসাদ আসলে বাউল। তিনি বাইরে ছিলেন ব্যারিস্টার, কবি কিন্তু ভিতরে ছিলেন ভক্ত। নানারকম কাজকর্ম, চিন্তা ভাবনার মধ্যেও গানই তাঁকে রসময় করে রেখেছে। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ-বেদনা-অপমান-লজ্জা-নৈরাশ্য আজ নিঃশেষে বিলীন হয়েছে, আর তাঁর ভক্ত হৃদয়ের আকুতিমাখা সুর গানের মধ্য দিয়ে চিরস্মরণীয় স্বাক্ষর এঁকে রেখে গেছে।

অতুলপ্রসাদের স্মৃতিতে সঙ্গীত, রবীন্দ্রনাথের লখনৌতে উপস্থিতি

১৯৩৫ সনের প্রথম দিকে যখন রবীন্দ্রনাথ লাহোর থেকে ফিরছেন (সঙ্গে ছিলেন অনিল চন্দ) তখন আমাদের প্রিয় অতুলপ্রসাদ আর ইহজগতে নেই — মাত্র কয়েকমাস পূর্বে গত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ লখনৌতে দু-একদিনের জন্য না থেকে কলকাতার দিকে এগোতে পারলেন না। এবার অতিথি হলেন প্রোফেসর নির্মল সিদ্ধান্তের। অতুলপ্রসাদ নেই কিন্তু তাঁর স্মৃতির আলোকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমরা সকলে বসবো বলেই এই সঙ্গীতের বৈঠক আয়োজিত হয়েছিল। এই আসরই লখনৌতে রবীন্দ্রনাথের শেষ বৈঠক — এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের এবারের আসা আমাদের কাছে স্মরণীয় বৈঠক হয়ে থাকবে। এই আসরে হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের বহিরঙ্গের সাজসজ্জা-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যে-প্রশ্ন উত্থাপন করলেন তার উত্তর, প্রত্যুত্তর, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ইত্যাদি সব নিয়ে একটা ছোট বই তৈরী হয়ে গেল, নাম, "সুর ও সঙ্গতি" — যার লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে নির্মল সিদ্ধান্তের বাড়ীতে সঙ্গীতের মজলিশ হলো — তার মুখ্য গায়ক শ্রীকৃষ্ণরতনজানকর। রবীন্দ্রভক্ত ও সঙ্গীতভক্ত অধ্যাপকেরা অনেকেই এসেছিলেন, আর আমি বিশেষ করে এনেছিলাম একজন বৃদ্ধ দাতা শিক্ষাবিদকে, নাম তার ডি. এন. বনার্জি [১] ইনি খুবই উচ্চ আদর্শে জীবন নিয়ন্ত্রিত করতেন। তাঁর স্ত্রী যেমন বৃদ্ধ, তেমন শান্ত, নম্র, ভদ্র। মিঃ বনার্জি একদিন আমাকে বলেছিলেন যে তিনি এই বুড়োবয়সে হাতের কিছু উদ্বৃত্ত টাকা (এক লক্ষ খানেক) শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচারে দান করতে চান। আমি আগেই জেনেছিলাম যে তিনি ইজাবেলা থোবার্ন কলেজে বেশ কিছু টাকা (অন্ততঃ ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকা) দিয়ে ফেলেছেন। আমি তখন বললাম বিশ্ববিদ্যালয়কে এবং কিছু বাঙালী প্রতিষ্ঠানকে দান করতে। তিনি রাজী হয়েছিলেন।

এই সব কথাবার্তা আমার মনে ছিল বলেই আমি সেই রাত্রির গানের মজলিস আরম্ভ হবার আধ ঘণ্টা আগে ডি. এন. বনার্জিকে রবীন্দ্রনাথের সম্মুখে নিয়ে এলাম। তিনি কবির সঙ্গে পরিচিত হবার পর কিছুক্ষণ আলাপ করলেন এবং এই প্রথম কবি দর্শন হলো বলে খুব খুশী মনে এক হাজার টাকা দর্শনী দিলেন। শান্তিনিকেতনের

---

১. কবি লখনৌতে এসেছেন শুনেই মিঃ বনার্জি আমাকে বললেন, যদি সম্ভবপর হয় তবে তিনি একবার সাক্ষাৎ করতে চান — তিনি কবিকে কখনো দেখেন নি। মিঃ বনার্জি একজন গোঁড়া ক্রীশ্চান। বিবাহ করেছিলেন পাঞ্জাব-প্রবাসী জনৈক বাঙ্গালী ক্রীশ্চানের মেয়েকে — এদের জমিজমা প্রচুর ছিল পাঞ্জাবে ও উত্তরপ্রদেশে — বিশেষ করে গোলাগোকরণনাথে। ইনি ডবলিউ. সি. বনার্জির ভ্রাতুষ্পুত্র। ইনি পুরো বিলিতী, ধার্মিক, সুশিক্ষিত, মুক্তহস্ত। এঁর পুত্র নীল বনার্জি আই সি. এস. — কন্যারা একজন ফ্রেঞ্চম্যান, একজন ইটালিয়ান বিবাহ করেছে। বনার্জি তিনমাস থাকেন লণ্ডনে, তিনমাস প্যারিসে, তিনমাস ইটালীতে আর তিনমাস ভারতবর্ষে।

আদর্শ ও শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন জীবনের কর্মপদ্ধতি দ্বারা তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন বলেই আমাকে বলেছিলেন, ভবিষ্যতে তিনি বড় রকম একটা দান শান্তিনিকেতনে দেবেন। এই কথাটা আমি উল্লেখ করেছিলাম যখন বনার্জির সঙ্গে কবির কথাবার্তা শেষ হলো। এই কথাটা যেই আমি বলেছি, তৎক্ষণাৎ কবি আমার দিকে চেয়ে বলে ফেল্‌লেন "দেখ, আমি যদিও শান্তিনিকেতনের জন্য অর্থ সাহায্য চাই ও অর্থ সংগ্রহ করছি, তবুও অর্থ সংগ্রহ বিষয়ে আমি জীবনে একটা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি এই যে, অর্থ সংগ্রহ বিষয়ে আমি একটা fatality (ভবিতব্যতা) দেখেছি। আমি দেখেছি, এক জায়গা থেকে আমি একটা বড় রকমের দানের জন্য বসে আছি — প্রতিশ্রুতি পেয়েছি — কিন্তু সে অর্থ কোনো অদৃশ্য কারণে আর এলো না; আবার এও দেখেছি যে, একটা জায়গায় আমি গেলেই অর্থ পাব — কিন্তু কোনো অদৃশ্য কারণে সেখানে কিছুতেই যেতে পারলাম না। বারবার এ রকম হয়েছে — তাই দেখে আমি অবাক্ হয়ে বলি — একেই বলে fatality! কবি বনার্জিকে ধন্যবাদ দিলেন। বনার্জি কিছু বুঝলেন, কিছু বুঝলেন না। শেষ কথাটি আমি বলবো — কবির কথাই সত্যি হলো — আর্থিক সাহায্য আর এলো না — অমিও কবির কথা মেনে নিয়েছি।

শ্রীকৃষ্ণরতনজানকর তাঁর গান শুরু করলেন — অনেক রাত-ধরে হলো — রাত ১১টা বাজল। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গীত পারদর্শিতার পরিচয় দিতে গিয়ে অনেক রকম কারুকার্য দেখালেন। একখানা গানই অনেকক্ষণ হলো — বোধহয় ৪০।৫০ মিনিট। তারপর আরো দুখানা গান ঠিক সেই ভাবেই চল্‌লো। প্রায় দু-ঘণ্টা ধরে গাইলেন — অনেক রকম কালোয়াতী করলেন। যখন গান থামলো আর কাছের লোকেরা একটু সরে দাঁড়াল, তখন কবি ধূর্জটিপ্রসাদকে আর অসিত হালদারকে উদ্দেশ্য করে বললেন "তোমরা বল, গান গাওয়া আর ছবি

আঁকার মধ্যে কোনো এক বিষয়ে বিশেষ তফাত দেখতে পাও কি ?" "তবে পরিষ্কার করে বলি — ছবি আঁকা একটা সীমাতে বদ্ধ — কিন্তু গানের তো দেখি সীমা নেই — হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত কোথায় শেষ হবে, তার মাপ, সীমা জানা নেই — কতটা অত্যাবশ্যকীয় তান, কতটা বাহ্যাড়ম্বর তা গায়কের মর্জির[১] উপরে। গান চলেছে তো চলেইছে — চিত্রাঙ্কনে, ভাগ্যিস, চিত্রপটের একটা সীমা আছে তাই বাঁচোয়া। ধূর্জটি, আমরা তো ভাবি ভারতীয়রা খুব বুদ্ধিমান — তারা জানে মানুষের ধৈর্য সীমাবদ্ধ — সেটা জেনেও গায়কেরা সময়ের সীমা মানতে চায় না — ফলে, এত সুন্দর সঙ্গীতের পূর্ণ রসাস্বাদ পেয়েও পেলাম না।" কবির এই মন্তব্যের মর্মার্থ এই যে, ব্যাপক আলাপে, তানের অতিমাত্রা বিস্তৃতিতে, ভিন্ন ভিন্ন ঢং এ গানটিকে সাজিয়ে দেওয়া গানের পক্ষে অপমানজনক নয় কি ? এতে গানের ভিতরের সত্যিকারের আর্ট প্রভূত পরিমাণে নিগৃহীত হবে না কি ? সাধারণ শ্রোতারা অথচ যাঁরা রসবোদ্ধা, তাঁরা কি ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছাবেন না ? কবির মতে গানকে যদি আর্টের মধ্যে রাখতে হয় তবে, পরিমিত

১. রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন — "বেঙ্গল স্টোর্সে গিয়ে যখন অসংখ্য রকম দামী কাপড় সারা প্রহর ধরে ঘেঁটে বেড়াই, ভাল লাগে, আরো ভাল লাগে, থেকে থেকে চমক লাগে, সংগ্রহের তারিফ করতে হয়। কিন্তু সুন্দরীর গায়ে যখন মানানসই একখানি মাত্র সাড়ি দেখি, বলি ব্যাস হয়েছে, বলি নে ক্রমাগত সব কটা সাড়ি ওর গায়ে চাপালে ভালোর মাত্রা বাড়তেই থাকবে — সব কাপড়গুলোই সমজদারের চোখে চমৎকার ঠেকতে পারে···মাঝের থেকে চাপা পড়ে যায় স্বয়ং সুন্দরী। ইংরাজী ভাষায় বলতে পারি যদি ক্ষমা করো, art is never an exhibition but a revelation ! Exhibition এর গর্ব তার অপরিমিত বহুলত্বে, revelation-এর গৌরব তার পরিপূর্ণ ঐক্যে, সেই ঐক্যে "থামা" বলে একটা পদার্থ আছে চলার চেয়ে তার মূল্য কম নয় — সে থামা অত্যন্ত জরুরী।"

আলাপ, পরিমিত তান, পরিমিত অলঙ্কার যুক্তিযুক্ত। কবির এই বক্তব্য সকলেই আমরা শুনলাম, ধূর্জটিবাবু কিছুটা একমত হলেও আলোচনা মুলতুবী রাখলেন। এই গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যের সুচিন্তিত উত্তর ধূর্জটিপ্রসাদ দিয়েছেন তাঁর "সুর ও সঙ্গতি"তে। এ পর্যন্ত হিন্দুস্থানী গানের ওস্তাদরা এই পদ্ধতিতে ঘণ্টাখানেক ভরে গান গেয়ে সব আসরেই "বাহবা" পেয়ে এসেছেন — রবীন্দ্রনাথ বিদ্রোহী — তাঁর অপূর্ব চিন্তাশীলতা, তীক্ষ্ণধার যুক্তি, সরস অথচ উদ্দীপ্ত ভাষার মাধ্যমে কী ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে তা সকল মর্মগ্রাহী পাঠকই সম্যক উপলব্ধি করতে পারবেন। ধূর্জটিপ্রসাদও ধৈর্য এবং রসিকতার সঙ্গে আপন যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন। আমার কোনও সন্দেহ নাই যে কবির বক্তব্য সুচিন্তিত। জলসা শেষ হলো — রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এই আমাদের শেষ জলসা।

পরিশিষ্ট

রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

কলকাতার গোপীমোহন ঠাকুরের (পিরালি বংশ) বংশে সূর্যকুমারের জন্ম। তাঁর কন্যার বিবাহ হয় ভট্টপল্লীর গঙ্গাধরের কুলীন বংশের জগন্মোহন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। দক্ষিণারঞ্জন জগন্মোহনের পুত্র ও সূর্যকুমারের দৌহিত্র। তিনি হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠাবান ছাত্র ছিলেন — তাঁর সতীর্থ সকলেই খ্যাতিলাভ করেছিলেন, যেমন — কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার প্রভৃতি। এঁরা সকলেই মনীষী ডিরোজিয়োর দ্বারা বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। কেবল তাই নয়, তাঁদের সময়ে বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে, সমাজক্ষেত্রে, রাজনীতিক্ষেত্রে দাঁড়িয়েছিলেন কয়েকজন বিশিষ্ট মহারথী — যাঁদের নাম ইতিহাস কোনোকালেই ভুলতে পারবে না, যেমন — ডেভিড্ হেয়ার, আলেকজাণ্ডার ডাফ্, ড্রিংকওয়াটার বেথুন, জর্জ টম্সন্[১] প্রভৃতি।

দক্ষিণারঞ্জন কলকাতার সদর আদালতের একজন উকিল ছিলেন। একদিকে আইন ব্যবসায়, অন্যদিকে দেশসেবা, স্ত্রী-শিক্ষা প্রচার আর জ্ঞানান্বেষণের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম। প্রথমে ষোল-সতেরো বছর বয়সে তিনি তাঁর নিজের অর্থ দিয়ে আরম্ভ করলেন এক সাপ্তাহিক পত্র "জ্ঞানান্বেষণ" আর এগুলি বিতরণ করতেন লোকের মধ্যে বিনামূল্যে। নিজের অনেক অর্থ ছিল কিন্তু হৃদয় ছিল আরো বড়। তাছাড়া একটি

---

১. রামমোহনের বন্ধু উইলিয়াম এডাম ইংলণ্ডে বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সোসাইটির একজন সদস্য টমসন ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের মেম্বার ছিলেন — যাঁকে ভারতের বন্ধু বলে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলেত থেকে ফেরবার সময় সঙ্গে করে এনেছিলেন।

মাসিক পত্র (পরে হলো পাক্ষিক, তারপর সাপ্তাহিক) "বেঙ্গল স্পেক্টেটর"-এর প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যেও তিনি অন্যতম। বোধ হয় ১৮৪৫-৪৬ সনে, তিনি কলকাতার কলেক্টরীর পদ গ্রহণ করেছিলেন — কয়েক বৎসর পর ১৮৫১-তে তিনি এ কাজ ছেড়ে দেন এবং তারপর ত্রিপুরার রাজসচিবের পদ গ্রহণ করেন সে পদেও বেশী দিন থাকেননি। পরে মুর্শিদাবাদের নবাবের দেওয়ান নিজামতের কর্ম গ্রহণ করেন। এই সময়ই বৃটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন কলকাতায় স্থাপিত হলো। কয়েক বৎসর পর তিনি মুর্শিদাবাদের কাজ ছেড়ে দিলেন। অনুমান ১৮৪২-৪৩ সনে তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন — প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর বেশ কয়েক বছর পর। দ্বিতীয় বিবাহ একটি মস্ত প্রেম-কাহিনী। একবার বর্ধমানে মহাসমারোহে তিনি নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন — সেই বসন্তপঞ্চমীর উৎসবে মহারাজা ও মহারানীর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ঘটে। মহারাজা তখন বেশ বৃদ্ধ কিন্তু মহারানী বসন্তকুমারী পরমা সুন্দরী ও যৌবনসম্পন্না — দক্ষিণারঞ্জন মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কিছুদিন পর বৃদ্ধ মহারাজার মৃত্যু হলো। এদিকে ক্রমে দেখা গেল, মহারানীর সম্পত্তি থেকে কিছু আয় আসছিল না, তখন মহারানীর আইনের পরামর্শের প্রয়োজন হলো। মহারানী আইন সংক্রান্ত বিষয়ে আইনজ্ঞ দক্ষিণারঞ্জনকে এ ভার দিলেন। একদিকে দক্ষিণারঞ্জনের ঐকান্তিক সহানুভূতি, অন্যদিকে মহারানীর ঐকান্তিক বিশ্বাস — অচিরেই দুইজন মিলিত হলেন। এই বিধবা ক্ষত্রিয়া রমণীকে হিন্দু শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সামনে দক্ষিণারঞ্জন বিবাহ করলেন — বিশ্বস্তসূত্রে শোনা যায়, তিনজন বিবাহে সাক্ষী হয়ে স্বাক্ষর করে-ছিলেন — গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লোকে বলতো গুড়গুড়ে পণ্ডিত), ডাক্তার ডি. গুপ্ত এবং দক্ষিণারঞ্জনের আর একজন বন্ধু। যে সব নথিপত্র পুস্তকাদি পাওয়া যায়, ঐতিহাসিক না হয়েও আমরা সাধারণ ভাবে উপরোক্ত সিদ্ধান্তে আসতে পারি। আমরা পাই, দক্ষিণারঞ্জনের

প্রথমা স্ত্রীর যে-কন্যা (মুক্তকেশী) তিনি রঘুনন্দন ঠাকুরকে বিবাহ করেন। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি দেশসেবায় কর্মবীরের মতো লিপ্ত থাকতেন এবং কিছুদিন পর দ্বিতীয় বিবাহ করেই লখনৌতে আসেন ও ক্রমে ক্রমে বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি যে স্বাস্থ্যবান ও বিত্তশালী ছিলেন সে সুখ্যাতিও ছিল। দ্বিতীয়া স্ত্রী মহারানী বসন্তকুমারীর গর্ভের সন্তান মনোহররঞ্জনকে কান্যকুব্জদেশীয় হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ কাশীরাম সুকুলের কন্যা রামকুমারী দেবীর সঙ্গে বিবাহ দিলেন। এঁর দুই কন্যা এবং এক পুত্র ভুবনরঞ্জন জন্মগ্রহণ করেন। ভুবনরঞ্জন উত্তরাধিকারী হয়ে তালুকদারী ভোগ করলেন কিন্তু তাঁর অকালমৃত্যু হলো। ইনি একটিমাত্র কন্যা-সন্তান রেখে গেছেন। পুত্র নেই বলেই তাঁর বিষয়ে লখনৌ এখন নিস্তব্ধ।

শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় — ইনি তালুকদারী এসোসিয়েশনের (সভার) সহ-সম্পাদক ছিলেন এবং এঁর পরিশ্রমেই দক্ষিণারঞ্জনের অনেক দায়িত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছিল।

রাজকুমার সর্বাধিকারী জি. এম. সি. বি.—ইনি ব্রিগেড্ সার্জন হয়ে সিপাহীবিদ্রোহের যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন এবং দমনকার্যে কৃতিত্বপূর্ণ কর্মতৎপরতা দেখিয়েছিলেন। যখন ক্যানিং কলেজ শুরু হয় তখন উপায়ান্তর ছিল না বলেই এঁকে সংস্কৃত সাহিত্য ও আইন পড়াবার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল।

দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় — নবাব আসফ-উদ্দৌলার সময়ে তোষাখানার দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত হন। এঁর বাড়ী ছিল উত্তরপাড়া।

চন্দ্রশেখর মিত্র — নবাব আসফ উদ্দৌলার মীরমুন্সির পদ অলংকৃত করতেন।

প্রিয়নাথ মিত্র —চন্দ্রশেখরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, লখনৌ রেসিডেন্ট সাহেবের কোষাধ্যক্ষ (Cashier) ছিলেন।

THREE POEMS OF POET ATUL PRASAD SEN

translated into English by an Englishman on the basis of phonetic English, rhythm and word-meaning

During the Christmas week of 1942 in Calcutta, Mrs. Iyengar invited me to her place and introducted me to an Englishman named Capt. Cave-Brown-Cave. He wrote many poems, some of which he read to us and suggested the possibilities of translating from one language to another even though the rendered language may not be known to the translator. We all felt interested but none of us felt that it could be anything worth the name. Our enthusiasm did not rise to that pitch. In early 1943, Mr. Cave Brown Cave wrote the following to Mrs. Iyengar* to fix a day when we could sit together —

"Dear Mrs. Iyengar,

......I fully agree with your proposals : atmosphere and

* Mrs. Hiran Iyengar, the eldest sister of poet Atul Prasad's next three sisters. Mrs Iyengar was married to a renowned physician of Madras but after her husband's premature death, she used to spend a few months every year with her brother Atul Prasad in Lucknow and a few months with her sister Mrs. Kiran Bose in Federation Road, Calcutta (who lost her husband prematurely and all her children) and the rest of the year in England or in France. After Hiran Iyengar lost her only son in Cambridge at the age of 20 years she broke down completely and spent most of the time with her brother at Lucknow while giving education to her little daughter Seeta in Lucknow Convent School. Seeta has now become a famous pianist and is running a fine Piano Salon in Paris. After A. P. Sen's death Hiran Iyengar left for Dehra Dun and finally settled in Bangalore. Junior Mrs. Iyengar went back to madras soon after Mrs. Kiran Bose died.

intimacy are essential attributes to such a discussion ; one must take the utmost care to have in such a gathering only those who are essential to the work in hand and those who both understand deeply and sympathetically, the artist himself and his thoughts······I suggest that either yourself or Mr. Dasgupta should choose one or two poems from the work of your brother...for me this is an experiment and the beginning of an experiment should not be too ambitious. For that reason, I would like the poems to be short···I would then like to go through those poems with you or Mr. Dasgupta both with their translations and without — hearing their rythms in the original and making notes on them ; hearing the translation and asking you many questions so that I may be sure that I understand what would be the strange similes to me, a European. Your poetry is full of allusions and similes which are deeper than the similes of our own poets because it has not only its own intrinsic meaning but a meaning of tradition. That is what makes it so difficult to understand and to translate in our language ; and a translator — like an actor or instrumentalist – must so understand what he is attempting to tell that it is, as if, it were his own···Don't imagine that result can or will be immediate ··· I dont think that any form of poetry can be willed and I am sure you understand me when I say that the most concentrated side of such work must be done alone and when one is mentally best attuned to doing it,·· they will help you to understand the expression of my mind — its potentialities as well as its limitations and understanding that you will be able to judge whether the expression of your brother's mind and my own are compatible. It is on this one fundamental factor that the possibility of a translation rests. There are many types of mind, many types of emotion, many types of expression and many types of poet."

Mr. Cave Brown Cave during his stay in Lucknow, came to hear of the reputation of Dhurjati Prasad Mukherjee and

one day called on him towards the end of the year 1943. Dhurjati Prasad telephoned to me to hasten to his house and there I again met Mr. Cave. We met several days in Mukherjee's library-cum-parlour and discussed the same subject in a bigger company with greater details recalling all the discussions we had in Mrs. Iyengar's house at Calcutta. Finally we fixed a day and three poems were read to him in our sitting at Lucknow in Dhurjati Prasad's house. The reading of them was repeated and some word-meanings and running translations were also given. After sometime Mr. Cave had to leave Lucknow and was posted in Delhi. Mrs. Iyengar, shifted to Dehra Dun and both of us (myself and Dhurjati Prasad) forgot to keep Mrs. Iyegar informed about what happened. A few months later (in April 1944) Mr. Cave wrote a long letter from Delhi to Mrs. Iyengar at Dehra Dun which runs as follows —

·······I was pleased to get your letter and particularly to know your address. I had hoped that Professor Dasgupta or D. P. Mukherjee in Lucknew might have been in touch with you and have told you how far we had progressed with the translation before I had to leave for Delhi. But it seems they have not. I am sorry for I know you must be very anxious to see any of the poems which I managed to put in an English setting. Most of the tratslation that I did was done with D. P. Mukherjee of Lucknow University......I found him most help ful and a very interesting man. Unfortunately we had a series of minor disasters : first he fell ill······then I fell sick... However in between times we managed to translate three of the poems. I was most anxious that we should get together and translate more of them but I think Mukherjee never really got over his sickness···the method of translation that we used was much as I suggested to you the day we met at Mrs. Prinsep's house, Mukherjee read me the poem in its original and I wrote it down in phonetic English, so that I could easily follow the rhythms. Then he gave me a literal

word for word translation. Any allusions which I found difficult I would ask him to explain and together we would try to think of a way of putting it into English. When I had satisfied myself that I knew the exact meaning of every word and the emotion and impression that the poem was designed to convey, I took my notes so smoothly to work on at my leisure. Of the three that I completed, one was done in Lucknow and two in Ranikhet during my leave there in May I found the work fascinating and interesting. It taught me many things ; it taught me how infinitely difficult translation is and how impossible it is to do justice to an original poem in another language. I am afraid, as you will see, my translations are not entirely succesful·· perhaps I attepmted to keep too closely to the wording and the rhythms of the original and so producted rhythms strange to English But you must read and judge them. I also found · kowing nothing of Bengali as a language that that did not prevent me, when I had learnt the poems as a series of sounds like music from appreciating exactly where the crises of the poems occurred. I found that your brother was a master of rhythms and that he supported his thought perfectly with the sound of the word he used to express himself and with the confluence of the rhythms with that sound. Such effects as those, I am afraid, it is not possible to translate from one language to another ······I am glad to hear that your daughter tried some of my music on the piano ; but I am afraid, that I am not really a musican and that the compositions were not of much value.

CBC.

To the above letter Mrs. Iyengar gave the following reply :

I thank you most sincerely for your letter and the poems. I could never have believed that it is possible to translate poems from one language to another and catch the spirit, the rhythms, the emotion etc so successfully as you have done and not knowing Bengali at all ! I think it is just wonderful—what could you not have done with these had you known the

language ! How did you manage to understand the subtle meanings ? Please donot regret having kept too closely to the wording and the rythms of the original at the sacrifice of English rhythm…to my idea it is the keynote of your success in the translation. You must have come across sometime a poem which is supposed to be a translation but no trace of the original is found — in itself it might be beautiful and correct but the very purpose is lost, I am so glad you have chosen three of my favourite poems. I mentioned to Dasgupta to read them to you first — there are others also very beautiful and I wish you could try some. How beautifully you have expressed the second line of the third poem — the meaning of the word "Shiva" is much too subtle hence difficult to translate — at the first teading it seemed not quite satisfying but as I read and read I began to appreciate it more and more and I think nothing could have been better — how exquisitely you have caught the idea … "fill thou my heart, thy thoughts, breathe thou in me …" I agree with you — final verse of the first poem is very nice indeed. I like the second also and I dont know why you are not satisfied — don't you think that the line — "hide, then hide your grief, your anguish ; crush till the pain reblossoms singing" ; is good ? … How I regret you cannot carry on the work — I can't think of anybody of Delhi at present to replace Dhurjati. What shall we do ? I feel so despondent about it …… H. Iyengar.

With these translations, and with Cave Brown's letters and with her own reply, Mrs. Hiran Iyengar was patiently waiting in Bangalore for some reliable person to turn up to whom she could deliver them to reach my hands for the purpose of publication. Mrs. Hiran Iyengar would be about 97 years old and living alone in Bangalore. Atul Prasad is long gone — his second sister Mr. Kiron Bose is no more — his youngest sister another Mrs. Iyengar (mother of Amar Iyengar I. C. S.) is no more — Dhurjati Prasad is no more.

It so happened that sometime back, I was returning from Mysore after attending Vice-Chancellor's Conference and I stopped at Bangalore for a day to find out if Hiran Iyengar was alive in which case we could spend a little time together. As good luck would have it, I could find out her house with kuntu's help where she was living being attended by a whole-time woman-attendant. Mrs. Hiran Iyengar was overwhelmed with joy on seeing me and after our talks she delivered to me a packet containing the poems translated, the letter of her own and also Mr. Cave's letters for publication if possible. I must apologise for the delay but I felt extremely happy that though delayed, the translations are appearing at the time of Atul Prasad's birth Centenary. I feel equally happy that the young poet Cave's ideas about translations and the possibilities of such translations together with his own performance done with understanding, sympathy and perception would be placed before the public soon.

First poem read out in original Bengali —

প্রভাতে যারে নন্দে পাখী
কেমনে বল তারে ডাকি ?
কোন্ ভরসায় তাঁহারে মাগি ?
কুসুম লয়ে গন্ধ বরণ
নিতি নিতি যাঁরে করিছে বরণ।
এ কণ্টক বনে কি করি চয়ন
কোন্ ফুলে বল সে পদ ঢাকি ?
নিশার আঁধারে ডাকিব তোমারে,
যখন গাবে না পাখী,
কণ্টক দিন চরণে যবে,
কুসুম মুদিবে আঁখি।

হেন পূজা যদি নাহি লাগে ভাল,
কেন তুমি মোরে করিলে কাঙ্গাল ?
বল হে হরি ! আর কত কাল
সুদিনের লাগি' রহিব জাগি' ?

Its English rendering —

How shall I call him ? Teach me. Tell me.
Him whom the birds greet with morning melody ?
What song have I ? My gift is not worthy.

Of him whom the flowers love, of him whom, rejoicing
Day after day, with colour and perfume, they welcome,
adoring.
What gifts can I gather ? From the pain and the parting
What flowers as garlands at his feet can I lay ?

Only at nightfall, dare I to sing to thee,
in the silent songstill hours ;
Only my barrenness have I to tender thee,
when night hides the flowers.
If thou wilt spurn of me this humble offering,
Why didst thou fashion me, unfruitful, unbearing ?
Lord ! to my darkness, when comes the morning ?
When comes thy songtime — thy fruitbearing day ?

Second poem read out —

মিছে তুই ভাবিস মন
তুই গান গেয়ে যা, গান গেয়ে যা, আজীবন।
পাখীরা বনে বনে, গাহে গান আপন মনে
নাইবা যদি কেহ শোনে, গেয়ে যা গান অকারণ

ফুলটি ফোটে যবে ভাবে কি কাল কি হবে ?
না হয় তাদের মত শুকিয়ে যাবি গন্ধ করি বিতরণ।
মনদুঃখ চাপি মনে হেসে নে সবার সনে
যখন ব্যথার ব্যথীর পাবি দেখা, জানাস প্রাণের বেদন।
আজি তোর যার বিরহে নয়নে অশ্রু বহে
হয়ত তাহার পাবি দেখা গানটি হলে সমাপন।

Its English rendering —

Heart ! My heart ! is your song
Sung for nothing, sighed for nothing, all life long ?
Birds for the joy of living, carol loud, wild woods ringing;
And though none hear their clear notes pealing,
Still rejoice nor stay their singing—
So should you sing, sing on.
Do the flowers at Sun's first greeting,
Fear the chill of the white winds blowing ?
Yet, like them, your day is passing,
the short hour's fragrance, scattered, done.
Hide, then hide your grief, your anguish ;
crush till the pain reblossoms singing ;
Only to him who too knows sorrow, only to him who
too knows longing,
tell your secret. Only then.
Who knows though now you may be weeping for his loss
for his parting,
Yet again you may meet him, when this song of mine
is sung.

Third poem read out —

কি আর চাহিব বল হে মোর প্রিয় !
তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো !

বলিব না "রেখো সুখে", চাহ যদি রেখো দুখে,
তুমি যাহা ভাল বোঝ তাই করিয়ো।
— শুধু তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো
যে পথে চালাবে নিজে, চলিবো চাবনা পিছে ;
আমার ভাবনা, প্রিয়, তুমি ভাবিও।
— শুধু তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও।
(দেখ) সকলে আনিল মালা, ভকতি-চন্দন-থালা
আমার যে শূন্য ডালা তুমি ভরিও !
— আর তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও।

Its English rendering —

What gift, my true beloved, shall I ask from thee ?
Help me to feel, to know thee : the Lord, the life,
the way.
Should grief and sorrow be my portion, yet will I bear,
nor ask for joy,
Thy love, my life, thy Will to guide me,
choose thou for me this day
Only, help me to feel, to know thee : the Lord, the life,
the way.
Guide then my steps ; thy law obeying, I will serve
and not forsake thee ;
Fill thou my heart ; thy thoughts, breathe thou in me.
Only, help me to feel, to know thee : the Lord, the life,
the way.
See···bringing garlands spiced with sandalwood
and offerings of piety,
All men come to thee. Fill thou my empty hands,
and in thy mercy
Help me to know and love thee : the Lord, the life,
the way.

I feel that Cave's translations are a unique experiment. It is generally believed that verse rhythms are untranslatable particularly when the two languages concerned are as alien as English and Bengali. Those who have rendered Bengali verse into English have tried to reproduce as faithfully as possible the meaning of the original in the rhythms of a foreign tongue. It is for this reason that these renderings even when accurate seem to be unsatisfactory. This is why when Tagore made his translations in the English GITANJALI and other books, he abjured verse and adopted the other harmony of prose, giving his English versions new rythms that are not to be found in the Bengali originals. Cave started his work at the other end. Ignorant of Bengali he approached Atul Prasad's poetry as a concord of beautiful sounds and tried primarily to import into his English translations the peculiar melodies of some exquisite Bengali songs. The meaning which he got from such word-to-word translations as Dhurjatiprasad and myself supplied came second. The method is particularly interesting here because Atul-Prasad was a musician (Composer cum Tune-setter) first and a poet afterwards — at least, all his poems, beautiful as they are, came in the form of songs. How far cave has succeeded it is for the experts and connoisseurs to judge but there can be no doubt about the originality of his approach.

অতুলপ্রসাদের দানপত্র

(আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত)

১৯৩০ সালের ৩০ মে তারিখে কবিবর অতুলপ্রসাদ সেন নিম্নলিখিত দানপত্রখানি করেছিলেন। কবির সম্পত্তির ট্রাষ্টিদ্বয় ছিলেন ব্যারিস্টার মিঃ এইচ. কে. ঘোষ ও মিঃ এস. সি. দাশ।

দানপত্রে তিনি তাঁর সম্পত্তির নিম্নলিখিতরূপ বিলি-ব্যবস্থা করেছিলেন :

(১) আমার পত্নী শ্রীযুক্তা হেমকুসুম সেন মৃত্যুকাল পর্যন্ত মাসিক ১০০৲ টাকা করিয়া পাইবেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ওই ১০০৲ টাকা এই উইলে যে সকল দাতব্যের ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে আনুপাতিক হারে ব্যয় করা হইবে।

(২) আমার পুত্র দিলীপকুমার সেন আজীবন ১০০৲ টাকা করিয়া পাইবেন এবং তাঁহার অবর্তমানে উহা এই উইলে বর্ণিত দাতব্য কার্যে অথবা অন্যান্য দাতব্য কার্যে ব্যয়িত হইবে।

(৩) ট্রাষ্টিরা দিলীপকুমার সেনের জীবনবীমার প্রিমিয়াম দিবেন তৎপর সম্পত্তির যে আয় ও উপস্বত্ব হইবে তাহা ট্রাষ্টিরা নিম্নলিখিতভাবে ব্যয় করিবেন :

(ক) রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের অধীন হেমন্ত সেবাসদনে (উইলকর্তার জননীর স্মৃতিরক্ষার্থ নির্মিত) মাসিক ২৫৲ টাকা করিয়া দেওয়া হইবে।

(খ) কলিকাতার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বা পরিচালিত দাতব্য প্রতিষ্ঠানে মাসিক ২৫৲ টাকা।

(গ) ঢাকা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ বা নববিধান ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক দাতব্য কার্যের জন্য মাসিক ২৫৲ টাকা।

(ঘ) উইলকর্তার পৈত্রিক গ্রাম ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার অধীন মাইগার গ্রামে বা উহার নিকটবর্তী পঞ্চপল্লী গুরুরাম হাই স্কুলে মাসিক ২৫৲ টাকা।

(ঙ) ব্রাহ্ম প্রচারকদের সাহায্যের জন্য মাসিক ২৫৲ টাকা।

(চ) লখনৌ বেঙ্গলী ক্লাব ও ইয়ংম্যানস অ্যাসোসিয়েশনে মাসিক ১০৲ টাকা।

(ছ) লখনৌ বেঙ্গলী গার্লস হাই স্কুলে মাসিক ১৫৲ টাকা।

(জ) মমতাজ পার্কের মুসলমান এতিমখানায় অথবা অন্য কোন উপযুক্ত মুসলমান এতিমখানায় মাসিক ৫৲ টাকা।

(ঝ) লখনৌতে বা অন্যত্র হিন্দুদের বা আর্য সমাজের কোন অনাথ আশ্রমে মাসিক ৫৲ টাকা।

(ঞ) ট্রাষ্টিদের বিবেচনাক্রমে এবং সম্পত্তির আয় অনুসারে অন্যান্য দান-কার্যেও ট্রাষ্টিরা টাকা দিতে পারিবেন।

ঘটনাপঞ্জী

১৭৭৮	রাজা রামমোহনের জন্ম
১৮০৯	মনীষী ডিরোজিয়োর জন্ম
১৮১৪	রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের জন্ম
১৮১৭	মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম
১৮২০	পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম
১৮২২	ওয়াজিদ্ আলি শাহের জন্ম
১৮২৬	রাজনারায়ণ বসুর জন্ম
১৮৩০	রামমোহন কর্তৃক ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা
১৮৩৬	রামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্ম
১৮৩৮	কেশবচন্দ্র সেনের জন্ম
১৮৩৮	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম
১৮৪৩	রামপ্রসাদ সেনের জন্ম
১৮৪৭	হেমন্তশশী সেনের জন্ম
১৮৬১	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম
১৮৬৬	ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতিষ্ঠা
১৮৭১	অতুলপ্রসাদের জন্ম
১৮৮৪	রামপ্রসাদ সেনের মৃত্যু
১৮৯০	হেমন্তশশী সেনের দ্বিতীয়বার বিবাহ
১৮৯২	অতুলপ্রসাদের ইংলণ্ড গমন
১৮৯৫	,, ইংলণ্ড থেকে প্রত্যাবর্তন
১৯০০	,, দ্বিতীয়বার ইংলণ্ড গমন ও বিবাহ
১৯০২	,, প্রত্যাবর্তন ও লখনৌ-জীবন আরম্ভ
১৯২৫	,, মায়ের মৃত্যু
১৯৩৪	,, মৃত্যু
১৯৩৬	,, স্ত্রীর মৃত্যু

নির্দেশিকা

দ

ধ

ন

প

হ